তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস : আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

বিশ শতকের গোড়া থেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ ঘটনাপ্রবাহ ভারতীয় জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত ভেঙে দিয়েছিল সব রোমান্টিক আবেশ। সেই সময় ব্যক্তিমানুষের মানসিক সংকট, হতাশা, মূল্যবোধহীনতা প্রভাব ফেলেছিল সাহিত্যেও। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, সাম্যবাদী আন্দোলন ও মার্কসবাদের চর্চা ভারতীয় শ্রেণিবিন্যাস ও আর্থিকভাবে শোষিত, বঞ্চিত, প্রান্তিক মানুষদের আলোচনার আলোর তলায় নিয়ে আসে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর গোটা পৃথিবী জুড়েই কমিউনিজমের প্রতি একধরনের আগ্রহ গড়ে ওঠে। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা নিয়ে বামপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সি.পি.আই মনে করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কানপুরে পার্টির কনফারেন্সের সময়, কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) মনে করে এর অনেক আগেই ১৯২০ সালে ভারতের বাইরে তাসখন্দে পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। যাই হোক, কমিউনিস্ট মতবাদের প্রভাব সেই সময়ের শিক্ষিত জনমানসে পড়েছিল। পরবর্তীকালে ভারতজোড়া স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ সবরকম সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ভেঙে দেয়। বাংলা উপন্যাসে তখন একদিকে অসন্তোষজনিত অস্থিরতা ও নাগরিক ক্লিন্নতা, মানসিক সংকট, প্রবৃত্তির নগ্নতা ও জটিল মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ, অন্যদিকে নাগরিক জীবনের বাইরে প্রান্তিক কৌম সমাজ। অবশ্য ভাঙন সেখানেও। আদিবাসী সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনেও তখন নাগরিক আগ্রাসন। স্বাধীনতা উত্তরকালে জোরালোভাবে এই গোষ্ঠীজীবনের কথা, প্রান্তিক জীবনের কথা, শোষিত-উপেক্ষিত জীবনের কথা প্রকাশ পেতে থাকল। এর কারণ অবশ্য এটাও, স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ। স্বাধীন ভারতে প্রথম ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রপতি "The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950"-এর দ্বারা আদিবাসী তালিকা নির্দেশ করেন

এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় সংশোধিত নির্দেশনামার দ্বারা সেই তালিকা পরিমার্জিত হয়েছে। যদিও এই চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ আমলেই। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে প্রথম "Primitive Tribes" শব্দবন্ধ ব্যবহার করে ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠী ও জনসংখ্যা লিপিবদ্ধ হয়। ১৯৪১ সালের আদমসুমারি রিপোর্টে শুধুমাত্র "Tribe" শব্দটি ব্যবহার করা হয় এবং অঞ্চল অনুযায়ী আদিবাসী সম্প্রদায় ও তাদের জনসংখ্যা জানানো হয়। স্বাধীন ভারতে মহাদেশস্বরূপ বিরাট আদিবাসী জগৎকে আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা গেল মহাশ্বেতা দেবীর মতো অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের লেখাতেও। সেই আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যের পাঠক মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেম-ঘৃণার সম্পর্কের পাশাপাশি জানলো তাদের ধর্ম, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কার, প্রথা, বিশ্বাস ও বিধিনিষেধকে। অন্ধ কুসংস্কারের ভয়ংকরতায় কখনও কখনও আঁতকে উঠলো। যত সময় গড়িয়েছে, আদিবাসী জীবনকে কাছ থেকে দেখা ও সেই অভিজ্ঞতায় তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন যেভাবে ধরা দিয়েছে, তার বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব রূপায়ণের তাগিদ লক্ষ করা গেছে বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রকাশিত সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিত মানস* (প্রথম চরণ ১৯৪৯, দ্বিতীয় চরণ ১৯৫১) বিহারের লোকজীবনের প্রতি বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত। উত্তর বিহারের গ্রামজীবনকে ঘিরেই উপন্যাসের ব্যাপ্তি আর জিরানিয়ার তাৎমাটুলির ঢোঁড়াইকে কেন্দ্র করে এই গ্রামজীবন পরিক্রমা। বারিদবরণ চক্রবর্তী লিখেছেন- "তাৎমাটুলি-ধাঙরটুলির সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে পাক্‌কী'র পথ ধরে গোরুর-গাড়ির গাড়োয়ানের জীবনে, সেখান থেকে চাষাবাসের মধ্যে দিয়ে,- কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের যেখানে সত্যিকারের বিরাটত্ব এবং অপার লাঞ্ছনা। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ঢোঁড়াই হয়ে উঠেছে লাঞ্ছিত ভারতবর্ষের প্রতীক, - পূর্ণিয়ার চলমান জনজীবনের মধ্যে দিয়ে দেখেছেন চলিষ্ণু ভারতবর্ষের

সামগ্রিকতাকে।"[১] এই ঢোঁড়াই-এর সূত্র ধরে ধাঙড়টুলির ওঁরাওদের খবরও দিলেন লেখক। বিহারের মফস্বল জিরানিয়া থেকে মাইল চারেক দূরে তাৎমাটুলি, যেখানে দ্বারভাঙা জেলা থেকে জাতে তাঁতি তাৎমারা জীবিকার সন্ধানে এসে পড়েছে। নিম্নবর্গের হিন্দু এই তাৎমারা চাষবাস করে না। এদের প্রধান বৃত্তি ঘরামির কাজ। অন্য সময়ে এরা কুয়োর বালি তোলার কাজও করে। তাৎমাটুলির পাশেই আদিবাসী ধাঙড়টুলি, যেখানে কোনো এক সময়ে সাঁওতাল পরগণা থেকে ওঁরাওরা এসে বসত করেছিল। পাশাপাশি অবস্থান সত্ত্বেও তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলির মধ্যে দীর্ঘদিনের ঝগড়া। দুই বসতির মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া কোশী-শিলিগুড়ি রাস্তা বা "পাক্কী" যেন তাৎমা ও ধাঙড়দের হৃদয়ের বিচ্ছেদরেখাও। জিরানিয়ার এই ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে ঢোঁড়াই-এর জন্ম। লেখক জানালেন ধাঙড়দের মধ্যে কয়েকঘর খ্রিস্টান। অধিকাংশ ধাঙড় সাহেবদের বাগানে মালির কাজ করে, কিন্তু আবার প্রয়োজনে অন্য কাজ যেমন রাস্তা মেরামতের কাজও তারা করে। খ্রিস্টান ওঁরাও সামুয়র চরিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে লেখক ওই এলাকার ইতিহাসের খবর দিলেন। নীলকুঠির সাহেবের বাড়িতে কাজ করতে যাওয়া সামুয়রের কালো দিদিমার টুকটুকে মেমের মতো রঙের মেয়ের জন্মের মধ্যে অতীতের যেমন একটা অধ্যায়ের ইঙ্গিত নিহিত ছিল, তেমনই আরেকটা অধ্যায় খ্রিস্টান মিশনারি বা পাদ্রী দ্বারা ওঁরাওদের ধর্মান্তরিতকরণ ও গির্জায় প্রার্থনায় বদলে দরিদ্র ওঁরাওদের দুধ দেওয়া। বাপ মরা ও মায়ে খেদানো তাৎমা ঢোঁড়াইকে ধাঙড়পাড়ায় শনিচরা, এতোয়ারীরা বিশেষ পছন্দ করে, ধাঙড়টুলির "ডাইনী বুড়ি" আকালুর মা ভালোবেসে শাঁকালু খেতে দেয়। তাৎমা ঢোঁড়াই-এর ধাঙড়পাড়ায় যাওয়া ও তাদের সঙ্গে রাস্তা মেরামতির কাজে যোগ দেওয়ার খবরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তাৎমাটুলি। ঢোঁড়াই-এর অবর্তমানে অপদস্ত হতে হয় তার পালনকারীকে, বাওয়াকে। ঢোঁড়াইকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে আমরা পাই ওঁরাওদের সংস্কার ও বিশ্বাসের

কথা, যেখানে বাঁশঝাড়ে ফুল আসা তাদের কাছে অমঙ্গলের সংকেত- "বাঙ্গাবাঙ্গী'র নির্দেশ আছে পাড়ার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটলেই বুঝবে যে আকাল, না হয় দুঃসময় কাছে। ঐ ফুলের ফসল ছেড়ো না। তাই দিয়ে বুটি তৈরি করে খাবে। তারপর বারো বছরের বেশি, সেখানে থেকো না - বারোবার গাছে তেঁতুল পাকুক। তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে, নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস করবার কথা ভাবতে হবে।"[২] শনিচরার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটেছে বলে তাকেই আগে চলে যেতে হয়। অবশ্য উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে লেখক খবর দিলেন খ্রিস্টান ওঁরাও ধাঙড় ছাড়া ধাঙড়টোলার সবাইকে উঠে যেতে হয়েছিল। কারণ, সেখানে "হাওয়া-গাড়ির কারখানা" হয়েছে। বেশি লোকজনেদের মধ্যে ধাঙড়রা থাকতে চায়নি বলেই চলে গেছে নেপালের মোরঙ্গে। ঢোঁড়াই-এর জীবনবৃত্তের অনুষঙ্গে এক বিশেষ সময়ের ব্যাপ্তি যেমন ধরা দিয়েছে, তেমন করে ধরা পড়েনি ধাঙড়টুলির ওঁরাও জীবন। রিজলে ওঁরাওদের সম্বন্ধে বলেছেন- "Oraon, Uraon, Kunokh, Kunrukh, a Dravidian cultivating tribe of Chota Nagpur, classed on linguistic grounds as Dravidian, and supposed to be closely akin to the Males of the Rajmahal hills."[৩] তবুও স্বল্প পরিসরে ওঁরাও জীবনের সূত্র ধরে এলাকার অতীত ইতিহাসকে পৌঁছে দিলেন পাঠকের কাছে আর সেই সঙ্গে তুলে ধরলেন আদিবাসী জীবনের উদ্বাস্তু হওয়ার চিরকালীন ট্র্যাজেডিকে।

১৩৫৭ সালে শারদীয়া "সত্যযুগ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *শবলার* কাহিনি। পরবর্তীকালে "পিঙ্গলা"র কাহিনি যুক্ত হয়ে একত্রে *নাগিনী কন্যার কাহিনী* নাম নিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, ১৯৫২ সালে। যে বেদিয়াদের জীবনকে লেখক প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকেই মিথ ও বাস্তবতার অপূর্ব সমন্বয়ে পরিবেশন করেছেন এই উপন্যাসে। *নাগিনী কন্যার কাহিনী* বিষবেদেদের কাহিনি, যার প্রতিটি সংস্কারে, বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মিথ, কালনাগিনীকে ঘিরে

থাকা গল্প। এই উপন্যাস ভালোবাসা ও ঘৃণার কথা বলে, দৈহিক ক্ষুধার কথা বলে, সমাজের অনাচারের কথা বলে এবং তুলে আনে নাগিনী কন্যা চিহ্নিতকরণের পেছনের ষড়যন্ত্রকে, সংস্কারকে হাতিয়ার করে ঘটানো অনাচারকে। রিজলে বেদিয়াদের চিহ্নিত করতে গিয়ে বলছেন- "The twelfth sept of the Santals, which is supposed to have been left behind in Champa, and has long been separated from the present tribe, bears the name of Bedia, and it seems not improbable the the Bedias of Choto Nagpur may be actually a branch of the Santals who did not follow the main tribe in their wanderings eastward."[৪] এই বেদিয়াদের একটি শাখা সাঁপেড়িয়া বা মাল বৈদ্য, যারা সাপের বিষ হিন্দু চিকিৎসকদের কাছে একসময় বিক্রি করত। সাপের বিষ বিক্রির প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে মেলে।

প্রফুল্ল রায় ঘুরেছেন সারা ভারত, দেখেছেন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, আসাম, নাগাল্যান্ড। মিশেছেন প্রান্তিক মানুষজনেদের সঙ্গে। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত *পূর্বপার্বতী* উপন্যাসে নাগাদের জীবন, সমাজ, সংস্কৃতির বাস্তব পরিচয় তুলে ধরছেন যেমন একদিকে, তেমনই দেখিয়েছেন তাদের সংস্কৃতিতে কীভাবে আঘাত হানছে খ্রিস্টান মিশনারিরা। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলছেন- "পূর্বপার্বতী' জাতিতত্ত্বের গবেষণা নয়; নাগাদের কাম-লালসা-হিংসা, ন্যায়-অন্যায়বোধ এবং জীবনের দ্রুত পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস।"[৫] জাতিতত্ত্বের গবেষণা না হওয়া সত্ত্বেও প্রফুল্ল রায় তাদের জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিককে যে অস্বীকার করেননি, তার দৃষ্টান্ত এই যে তিনি "লেখকের কথা" অংশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা নাগাভূমিতে বসবাসকারী নাগাদের সম্পর্কে বলেছেন– "নাগাদের মধ্যে গোষ্ঠী এবং বংশগত অসংখ্য ভাগ ও ভেদ রয়েছে। নানা ভাষা এবং উপভাষার প্রচলন আছে। সমাজব্যবস্থা উৎসব এবং ধর্মাচরণের আনুষঙ্গিক রীতিও সর্বত্র

এক নয়।"[৬] যূথচারী এই নাগাদের বংশানুক্রমে ঘটে আসা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, প্রতিহিংসা ও নারীকে অধিকার করার ইতিহাস উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। উপন্যাসে স্পষ্টতই দু'টি বিভাজন, প্রথম অংশে নাগাদের প্রেম ও প্রতিহিংসার কাহিনি এবং দ্বিতীয় অংশে ভারতের মূলস্রোতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাদের জীবনকে মিলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। জোহেরি বংশের ছেলে জেভেথাঙ ও পোকরি বংশের মেয়ে নিতিৎসুর প্রেম ও প্রত্যাখ্যানকে কেন্দ্র করে যে হিংসা, হত্যা ও প্রতিহত্যা কেলুরি ও সালুয়ালাঙ বস্তির মধ্যে বংশপরম্পরায় চলতে থাকে, ইতিহাসের পরিহাসে সেই প্রেমের আবার জন্ম হয় সেঙাই ও মেহেলীর হৃদয়ে। এই ভালোবাসা পুরোনো হিংসা ও রক্তারক্তিকে ভুলিয়ে মান্যতা পেতে চায় ও কাহিনি এগিয়ে চলে। মানুষের প্রেম ও ঘৃণার আখ্যান লিখতে বসে নিপুণ দক্ষতায় ঔপন্যাসিক নাগাদের রীতি-নীতি, সমাজ অনুশাসন, বিশ্বাস ও সংস্কারকে তুলে আনলেন। কথায় কথায় head hunting-এ অভ্যস্ত সাহসি নাগারা কীভাবে অতিপ্রাকৃত শক্তিতে অবিশ্বাস্যরকম ভীত হয়ে পড়ে, উপন্যাসে এরকম দৃষ্টান্ত একাধিকস্থানে পাওয়া যায়।

নাগাদের সম্পর্কে ভেরিয়ার এল্যুইন বলেছেন- "The derivation of the word 'Naga' is obscure. It has been explained as meaning 'hillman', from the Sanskrit *naga,* a mountain. It has been linked to the Kachari *naga*, a young man or warrior, Long ago, Ptolemy thought it meant 'naked'. It has nothing to do with snakes. The most likely derivation- to my mind–is that which traces 'Naga' from the word *nok* or 'people', which is its meaning in a few Tibeto-Burman language, as in Garo, Nocte and Ao. It is common throughout India for tribesmen to call themselves by words meaning 'man', an attractive habit which suggests that

they look on themselves simply as *people,* free of communal or caste associations."[৭] নাগা সমাজ গোষ্ঠীবদ্ধ। সর্দারই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সর্দারও প্রচলিত রীতি-নীতি ও সংস্কার মেনেই সমাজ পরিচালনা করে। সমাজের অনুশাসন কখনও কখনও রক্তের সম্পর্ক, ভালোবাসার সম্পর্ককেও অস্বীকার করে অনুশাসনভঙ্গকারীকে কঠিন শাস্তি দেয়। প্রেমিক উলুবাঙের প্রতি ভালোবাসার তাড়নায় হোক বা শরীরের কামনায় হোক চিনাসঙবা রাতে মোরাঙে প্রবেশ করে, অথচ নাগা সংস্কারে মোরাঙে নারীপ্রবেশ নিষিদ্ধ। "মোরাঙ" হল– "Prominent in many villages is the Morung or dormitory for the young unmarried men,- some tribes also have small houses for the unmarried girls. The Morungs are guard-houses, recreation clubs, centres of education, art and discipline and have an important ceremonial purpose."[৮] ছেলেদের মোরাঙে প্রবেশের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ চিনাসঙবার দেহ বর্শায় গেঁথে দিতে চায় লাংফু গ্রামের আধিবাসীরা। কারণ তারা বিশ্বাস করে নারীর প্রবেশে মোরাঙের শুদ্ধতা নষ্ট হয় এবং আনিজার রোষ এসে পড়ে তাদের ওপর। এই অবস্থায় গ্রামের সবাইকে উপোস করে এবং আনিজার উদ্দেশ্যে হলুদ কুকুর বলি দিয়ে আনিজার কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। খেজাঙের ঝোপে লুকিয়ে থাকা চিনাসঙবার ওপর বর্শা দিয়ে প্রথম আঘাতটা করতে চায় প্রেমিক উলুবাঙই। অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি ভয়ে ও সামাজিক অনুশাসনে যার কথা ছিল ভালোবাসাকে রক্ষা করার, সেই বেশি করে আঘাত হানতে চায়, জোরের সঙ্গে চিনাসঙবাকে অপরাধী প্রমাণ করতে চায়, বেশি করে নিয়ম মানার তাগিদটা যেন তারই। হয়তো নিজেকে বাঁচানোর এ এক জটিল মানসিকতা, যেখানে পাহাড় ও সমতলের মানুষের মধ্যে, আদিবাসী-অনাদিবাসী মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সমাজের রীতি-নীতি বা নিয়ম না মানার ফলে কঠিন শাস্তির উদাহরণ উপন্যাসে আরও আছে।

অঙ্গামী সর্দারের মেয়ে হ্যাজাও ভালোবেসে ফেলে রেঙমা সম্প্রদায়ের ছেলে এটোঙাকে। ভিন্ন জাত হেতু অঙ্গামী ও রেঙমাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ। মন সবসময় নিয়ম বা বাধা নিষেধের সোজা পথে হাঁটে না বলেই সম্প্রদায়কে অস্বীকার করে দুই পাহাড়ি যৌবন পাহাড়ের সুড়ঙ্গে সংসার পাতে, আগলে রাখে একে অপরকে ও আগত সন্তানের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। অথচ বিদ্রোহীদের শাস্তি নাগা পাহাড়ের নিয়মে মৃত্যু, সে প্রেমিকাই হোক বা সন্তান- "সামনের একটা জোয়ান ছেলের হাত থেকে খারে বর্শাটা নিজের থাবার ছিনিয়ে নিয়েছিলো অঙ্গামী সর্দার। এই পাহাড়ে করুণা নেই, মমতা নেই। সমাজের বিচারে অন্যায় কিংবা পাপ সাব্যস্ত হলে তার একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যু। এই অমোঘ বিধানের হেরফের হবার উপায় নাই। অঙ্গামী সর্দারও সমাজপতি। সব রকম দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা।"[৯] অন্যদিকে, বিদ্রোহী হ্যাজাও তার সাত মাসের সন্তানকে গর্ভে আগলে পিতার নৃশংসতার প্রতিশোধ নিতে চায় তার স্বপ্নকে ভেঙেচুরে দেওয়ার অপরাধে, তার ভালোবাসার পুরুষকে, যৌবনের সঙ্গীকে, অনাগত সন্তানের পিতাকে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে। আক্রমণ করে বাবা অঙ্গামী সর্দারকে। এভাবেই ভালোবাসা আর ঘৃণা সহাবস্থানে পাহাড়ের পাথুরে কঠিন অনুশাসনের বুকে ব্যতিক্রমীরা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের প্রথম অংশের মূল কাহিনি সেঙাই ও মেহেলীর পারস্পরিক আকর্ষণ, প্রেম ও সম্প্রদায়ের নিষেধকে ঘিরে আবর্তিত। প্রথম দর্শনেই উভয়ের উভয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মে। অথচ হিংসার অতীত ইতিহাস তাদের মিলনের পথে অন্তরায়। সেঙাই মেহেলীর আকর্ষণে লুকিয়ে শত্রুপক্ষের বস্তি সালুয়ালাঙে পৌঁছোয়, অন্যদিকে মেহেলী পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়া দাদার হত্যাচেষ্টাকারী অচেতন সেঙাইকে উদ্ধার করে প্রাণে বাঁচায়, ভালোবেসে আত্মসমর্পণ করতে চায়, সেঙাইকে বশে রাখতে ডাইনি নাকপোলিবার কাছে মন্ত্র আনতে যায়, শেষে সেঙইয়ের খোঁজে একা একাই শত্রুপক্ষের বস্তি

কেলুরি গ্রামে পৌঁছোয়। সেঙাইও কোহিমা থেকে ফিরে একমাত্র মেহেলীকেই বিয়ে করবে বলে জানায়। উভয়ের ভালোবাসার তীব্রতা বহুদিনের রক্তের গন্ধ ভুলিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু কেলুরি বস্তি ও বস্তির সর্দার এ সম্পর্ককে মেনে নিলেও সালুয়ালাঙ বস্তি মেনে নেয়নি, তারা একে নিজেদের পরাজয় হিসেবেই দেখেছে।

উপন্যাসের শুরু একটা শিকারকে কেন্দ্র করে। শিকারকে ঘিরে নাগাদের সংস্কার- শিকারের আগের দিন অবিবাহিতরা শুয়োর হত্যা করবে না এবং বিবাহিতরা আগের রাতে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবে না। শিকারের আগে তারা সবরকম শুচিতা রক্ষা করে। শিকারকালে বাঁশের চাঁচারিতে নির্দিষ্ট শব্দ তুলে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। শিকার ফস্কে যাওয়াকে নাগারা অনাচারের ফলরূপে দেখে এবং নাগা সমাজে এইরূপ অনাচারের জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট, কারণ তারা মনে করে এই অনাচারে আনিজার ক্রোধ এসে পড়বে তাদের ওপর। শিকার ও পাহাড়ের গায়ে ধাপচাষ খাদ্য সংস্থানের একমাত্র উপায় বলেই হয়তো এদের জীবন ঘিরে এইধরনের সংস্কার গড়ে উঠেছে। বছরের একটা সময় তারা ‘‘সিঁড়িখেতে’’ ফসল ফলায়। শুধু ‘‘নমক’’ বা নুন নিয়ে আসে শহর কোহিমা থেকে সম্বরের ছাল, বাঘের নখ বা বর্শার বিনিময়ে। শিকারে যাওয়ার আগের রাতে রেঙকিলান স্ত্রী সালুনারুর সঙ্গে সহবাস করে, আর সেই অপরাধবোধ, আনিজার সম্ভাব্য ক্রোধের আশঙ্কা ও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গজনিত শাস্তির ভয় শিকারের পুরো সময় রেঙকিলানকে প্রায় অবশ ও আচ্ছন্ন করে রাখে- ‘‘তবে আজ, আজ কেন তার পেশীগুলো এমন শিথিল হয়ে আসছে? বার বার চেতনার দিগন্ত থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ভয়ানক আনিজার মুখ? সেই অপরাধ। স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে অপবিত্র দেহমন নিয়ে শিকারে আসা। পাপবোধটা যেন শ্বাসনলীর ওপর চেপে চেপে বসছে রেঙকিলানের।’’[১০] একটা গলার আওয়াজকে স্ত্রী সালুনারুর কণ্ঠস্বর ভেবে তাকে লক্ষ করে

খাড়া পাহাড়ের উতরাইয়ে মিলিয়ে যায় সে, পরে খাদের মধ্যে পাওয়া যায় তার মৃতদেহ। নাগাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয় অনাচারের ফলস্বরূপ আনিজার রোষের শিকার হয়েছে সে। সালুনারুকেও একই সঙ্গে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করতে চায় সর্দার। সালুনারু শত্রুবস্তি সালুয়ালাঙে গিয়ে প্রাণে বাঁচে এবং সালুনারু মারফৎ কেলুরি বস্তির সেঙাইয়ের দ্বারা খোনকের ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণের খবরও পৌঁছোয় সালুয়ালাঙ বস্তিতে। নাকপোলিবার কাছে ডানবিদ্যার বা ডাকিনীতন্ত্রের দীক্ষা নিতে গিয়ে সে জানতে পারে মেহেলীর সেঙাইয়ের প্রতি অনুরাগের কথা ও আহত সেঙাইকে মেহেলী কর্তৃক লুকিয়ে রাখার খবর। কেলুরি বস্তির প্রতি প্রতিহিংসায় সালুনারু সেঙাইয়ের লুকিয়ে থাকা গোপন স্থানের খবর পৌঁছে দেয় সালুয়ালাঙ বস্তিতে। খোনকের প্রেমিকা লিজোমু তীব্র যৌনকামনায় খোনকের অবর্তমানে তারই হত্যাচেষ্টাকারী সেঙাইকে পেতে চায়, নয়তো গ্রামের সর্দারকে ডেকে এনে মেরে ফেলতে চায়। এই পরিস্থিতিতে সেঙাইয়ের হাতে লিজোমুর মৃত্যু ঘটে। সেঙাইকে পুড়িয়ে মারতে গিয়ে লিজোমুর দেহকেই অজান্তে পুড়িয়ে দেয় তাদের বস্তিরই মানুষ, স্বয়ং লিজোমুর বাবাও। বারবার সেঙাইকে খোনকের "হত্যাচেষ্টাকারী" বলার কারণ সেঙাইয়ের আঘাতে খোনকের মৃত্যু ঘটেনি, তার মৃত্যু ঘটেছে নাগাদের কুসংস্কারের ফলে। তামুন্যু বা চিকিৎসকের পরামর্শে বস্তিতে মড়ক লাগার ভয়ে সর্দার সিদ্ধান্ত নেয় মরণাপন্ন খোনককে খাদে ফেলে দেওয়ার ও সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। অথচ সেঙাই পরবর্তীকালে রানি "গাইডিলি"র সংস্পর্শে ও আধুনিক চিকিৎসায় সেরে উঠে বুঝেছিল খোনকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ছিল নাগা পাহাড়ের মানুষদের অজ্ঞতা ও ভয়।

মেহেলীর সঙ্গে শত্রুবস্তির ছেলে সেঙাইয়ের ভালোবাসার খবর জানাজানি হতে মেহেলীর বাবা তার বিয়ের স্থির করে নানকোয়া গ্রামের রাঙসুঙের ছেলে মেজিচিজুঙের সঙ্গে। মেজিচিজুঙ "বাঘ মানুষ"-

"It was believed that under certain circumstances the soul of a person could leave the body and temporarily take residence in a tiger or leopard."[১১] মেহেলীর বাবার "বাঘ-মানুষ" বলে চিহ্নিত মেজিচিজুঙের সঙ্গে মেহেলীর বিয়ে ঠিক করার কারণ বড়ো রকমের কন্যাপণ বা বউপণ বা "টেনেন্যু মিঙ্গেল" আদায়। কন্যাপণ হিসেবে মেহেলীর বাবা সাঞ্চামখাবা পেয়েছে চারটে প্রাচীন খারে বর্শা। এছাড়া আরও এসেছে কড়ির গয়না, কানের নীয়েঙ দুল, হাতির দাঁতের হার, মোষের শিঙের মুকুট, পিতলের গলাবন্ধ পঞ্চাশটা সাধারণ বর্শা। নাগা সমাজে প্রাচীন বর্শাগুলো বিবাহের সময় যৌতুক হিসেবে দেওয়ার জন্যই রাখা থাকে। বিবাহের নিয়ম অনুসারে দু'টি করে খারে বর্শা মেয়ের বাবা ও বড়ো মামা পাবে। নাগারা বিশ্বাস করে, বড়োমামা এই খারে বর্শা না পেলে বিবাহিত মেয়ের সন্তান হয় না, আর বন্ধ্যা নারী নাগা সমাজে ডাইনি রূপে চিহ্নিত। কারণ, সমাজে নারীর ধারণা আসলে উর্বরতার ধারণার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। নাগা সমাজে বন্ধ্যা নারীর স্থান হয় না স্বামীর ঘরে, এমনকি বাপের ঘরেও। তাই স্বামী খেদানো, বাপে তাড়ানো বাঁজা নাকপোলিবা "ডাইনি" হয়ে যায়। একসময়ে নিজের বিশ্বাসেও পুরোপুরি "ডাইনি" হয়ে ওঠে সে। ডাইনি মন্ত্র শিখে নেয় রসিলটাকের কাছ থেকে। ডাইনি প্রথার সবচেয়ে ভয়ংকর দিক যখন আক্রান্ত নারী নিজেকে ডাইনি বলে বিশ্বাস করে। নাকপোলিবা বিশ্বাস করে ডাইনি হয়ে নিজের বাবা ও স্বামীকে সে হত্যা করেছে, সালুনারুর গলা নকল করে রেঙকিলাঙকে খাদে ফেলে মেরেছে। এও একধরনের জটিল মানসিক অবস্থা যেখানে সমাজচ্যুত, গৃহচ্যুত, সাধের সংসারচ্যুত অসহায় নারী ডাইনির অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি বাকিদের ভয়কেই নিজের ক্ষমতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সামান্য সুখ পেতে চায়, নিজের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চায়- "যারা আমাদের বস্তিতে থাকতে দেয় না, তাদের শায়েস্তা করতে হবে। নিজেদের দোষ নেই; এই ধর আমি বাঁজা, তুই আনিজার নামে রুখে উঠেছিলি, অমনি

আমাদের বস্তি থেকে ভাগিয়ে দিলো। ওরাই তো আমাদের ডাইনী করে। যেমন আমাদের ডাইনী বানায় তেমনি তার ঠ্যালা সামলাক।"[১২] যে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাধারণের বিশ্বাসে নাকপোলিবা মৃত্যু ডেকে আনতে পারে বলে মনে করে, ভূমিকম্পে নিজে সেই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে একজন সাধারণ মানুষের মতো ভয় পায়, পালাতে চায়, কিন্তু শেষে ডাইনি সত্তার মিথ্যে ধারণার ওপর ভর করে এই ভয় পাওয়াকে ঘৃণা করে, ভূমিকম্প থামানোর মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে একসময় স্তব্ধ হয়ে যায়। অতীতের যুবতি নাকপোলিবাকে বুকের মধ্যে কবর দিয়ে নাকপোলিবার ভয়ংকর ডাইনি হওয়ার যে আড়াল, তা এই ভূমিকম্পের সংকট মুহূর্তে খসে যায়, যৌবনের নাকপোলিবাকে মনে পড়ে ডাইনি নাকপোলিবার।

নাগা সমাজে যখন ডাইনি প্রথার চর্চা চলে তখন সেই নৃশংস প্রথার বিরোধিতা না করে বরং তাকে কাজে লাগাতে চায় কিছু মানুষ, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। উপন্যাসে সেই মানুষটি পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। উপন্যাসে সুনির্দিষ্ট বিভাজন না থাকলেও সেঙাইয়ের কোহিমায় আসা, ম্যাকেঞ্জীর সঙ্গে পরিচয় ও গাইডিলিওর প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের বাঁক বদল ঘটে। নাগা সমাজ নানাবিধ সংস্কার, পারস্পরিক হিংসা ও রক্তারক্তির পরিসর অতিক্রম করে পরাধীন ভারতের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, সামিল হয়ে পড়ে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে। আন্দোলনের প্রাথমিক আভাসটুকু উপন্যাসে পরিলক্ষিত। আদিবাসী সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যের সুযোগে এ দেশে খ্রিস্টান মিশনারিরা খ্রিস্টধর্মের প্রচার করে এসেছে, মাঝে মাঝে সেবাধর্মের চেয়ে ধর্মপ্রচারের উগ্রতাও যে চোখে পড়েনি, এমন নয়। এ উপন্যাসে বড়ো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর ধর্মপ্রচারের উগ্র নেশা তার মিশনারি কর্মের বিশুদ্ধতাকে ও সেবাধর্মকে কালিমালিপ্ত করে। "নমকে"র খোঁজে শহরে আসা নাগা পুরুষদের তিনি নুন দেন, প্রয়োজনীয় জিনিস দেন। আপাতদৃষ্টিতে বস্তুগত বিনিময় না ঘটলেও পাঠক বুঝতে

পারে আসলে নাগা পুরুষদের হাতে প্রয়োজনীয় জিনিস তিনি তুলে দেন ধর্মের মূল্যে। বুকের মধ্যে ক্রশ আঁকলেই প্রয়োজনের সবকিছু পাওয়া যাবে। কোনও অভাব থাকবে না। এত সহজ? এত সহজ! পাহাড়ের মানুষদের কাছে সমতলের মানুষদের শত্রু বানিয়ে তুলে দেশের নিজের অধিবাসীদের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করে ম্যাকেঞ্জী লক্ষ্যে পৌঁছতে চান। এইসময় দেশ জুড়ে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ সমতলকে প্লাবিত করে আছড়ে পড়েছিল পাহাড়েও। কোহিমায় মাধোলালের কাছে সেঙাই গান্ধীজি ও রানি গাইডিলিওর আশ্চর্য আন্দোলনের কথা শোনে, রক্তের মধ্যে হিংস্রতা ও head hunting-এ অভ্যস্ত নাগা যুবক অহিংস আন্দোলনের কথা শোনে, বোঝে মাধোলালের মতো সমতলের মানুষেরা বিদেশি নয়, শত্রু নয়; বরং আপন হওয়ার অভিনয় করা ম্যাঙ্কেঞ্জীরাই বিদেশি, শত্রু। গান্ধী ও গাইডিলিওর আন্দোলন সেই স্বৈরাচারী, শোষক রাজশক্তি ও সেই শক্তির সহায়কদের বিরুদ্ধেই। অচিরেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে ম্যাকেঞ্জীর স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে সেঙাই। সমতলে গান্ধীজির মতো পাহাড়ে রানি গাইডিলিও যে ব্রিটিশদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল, উপন্যাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপন্যাসের এই উপাদানগুলো ইতিহাসনিষ্ঠ। ১৯৩০ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলন আসামের পার্বত্য অঞ্চলেও ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। নাগা পার্বত্য অঞ্চল তখনও আসামের অন্তর্গত। এই পার্বত্য অঞ্চলে নাগাদের নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন যাদুনাঙ ও তাঁর সম্পর্কিত বোন গাইডিলিও বা গাইদিলিউ বা গুইদালো। যাদুনাঙ দীর্ঘদিন ধরেই নাগাদের মধ্যে স্বাধীন ও শোষণ-পীড়নহীন জীবনের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ পরিচালনা করছিলেন। আন্দোলন চলাকালীন ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে যাদুনাঙ ধরা পড়লে বিদ্রোহের নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে তরুণী গাইডিলিওর ওপর। পরাধীন নাগা অঞ্চলের কাবুই বংশে গাইডিলিওর জন্ম। কিছুদিন মিশনারি স্কুলে পড়াশোনাও করেছিলেন।

পরবর্তীকালে যাদুনাঙ-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করেন। গাইডিলিওর নেতৃত্বে বিদ্রোহের অপ্রতিরোধ্যতায় ভয় পেয়ে ব্রিটিশ সরকার গাইডিলিওর নামে "ডাইনি" অপবাদ ছড়িয়ে দিতে চায়। আদিবাসীদের কাছে "ডাইনি" শব্দের ভয়ংকরতা ও পরিণতি সম্বন্ধে অবগত ম্যাকেঞ্জীকে উপন্যাসে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করতে দেখা যায়। ব্রিটিশ কর্তৃক এই নৃশংস ষড়যন্ত্র এই প্রথম নয়। ইংরেজদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরাসি কৃষক বিদ্রোহের নেত্রী জোয়ানকে ১৪৩১ সালে "ডাইনি" বলে প্রচার করে দেওয়া হয়। সেইবার ইংরেজরা এই ষড়যন্ত্রে সফলতা পেয়েছিল। জোয়ানকে তার কৃষক সঙ্গীরাই ধরিয়ে দেয় এবং বিচারের প্রহসনে জোয়ানের নির্মম মৃত্যু ঘটে। তবে গাইডিলিওর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। সুপ্রকাশ রায় লিখছেন, "বিদ্রোহী নাগারা ইংরেজ শয়তানদের এই মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস করল না, ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের চক্রান্ত ব্যর্থ হল। ইংরেজদের এরূপ বর্বরসুলভ প্রতিহিংসাবৃত্তি এই নূতন নয়। ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে তারাই ফরাসী দেশের বীর কৃষক কন্যা 'জোয়ান অফ আর্ক'-কে 'ডাইনী' বলে প্রচার করেছিল এবং আগুনে পুড়িয়ে করে প্রতিহিংসার জ্বালা মিটিয়েছিল। তখন ফরাসী দেশ ছিল ইংরেজদের অধীন। ইংরেজদের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হয়ে ফরাসী কৃষকেরা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করলে গাইদিলিউর মতই জোয়ানও সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছিলেন।"[১৩] ধৈর্য ও সেবায় গাইডিলিও নাগাদের আপনজন হয়ে ওঠে, রানি হয়ে ওঠে। বিশ্বাস অর্জন করে। নাগা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রচার করতে থাকে। কেলুরি গ্রামে রানির পৌঁছানো ও পালিয়ে যাওয়ার পর ইংরেজ পুলিশ সুপার বসওয়েলের নেতৃত্বে আক্রমণ সংঘটিত হয়। বসওয়েল ও ম্যাকেঞ্জীকে সঙ্গ দেয় কেলুরি গ্রামের পুরনো শত্রু মেহেলীর সালুয়ালাঙ গ্রাম। ইংরেজের বন্দুকের গুলির সামনে, নৃশংসতার সামনে অসহায় হয়ে যাচ্ছিল পাহাড়ি আদিম রক্তও। এই নৃশংস আক্রমণে বুড়ি বেঙসানু ও গর্ভবতী জামাতসু

মরেছে, কেলুরি গ্রাম পুড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে অত্যাচারী শাসক, অসংখ্য নাগা মেয়ের সম্মান নষ্ট হয়েছে আর মেহেলীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সেঙাইয়ের থেকে। শিলং জেলে চালান করে দিয়েছে সেঙাইকে। সেখানে সেঙাই অন্যান্য নাগা কয়েদিদের কাছে রানি গাইডিলিওর কথা প্রচার করেছে, ইংরেজের অত্যাচারের খবর শুনিয়েছে। মেহেলীর প্রতি যে প্রেম তাকে সংস্কার ভাঙতে শিখিয়েছিল, তাইই পরিণতি পেয়েছে দেশপ্রেমে। ভারতজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের খবর ও গান্ধিজির নাম শুনিয়েছিল যে মাধোলাল, তার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে সেঙাই, "হাউ-হাউ শব্দ করে সেঙাই কাঁদছে। চুল ছিঁড়ছে। মাধোলালের দেহটাকে আঁচড়াচ্ছে, কাঁমড়াচ্ছে।"[১৪] উপন্যাসের শুরুতে নাগাদের মধ্যে শত্রুতা বা সমাজ অনুশাসনভঙ্গে যে নিষ্ঠুর রক্তপাতের হিংস্রতা পেয়েছি, উপন্যাসের শেষে অনাত্মীয় মাধোলালের মৃত্যুতে ভেঙে পড়া সেঙাই আভাস দেয় আদিম নাগারক্তে, জীবনে, মননে ভারতীয়ত্বের চেতনা, মানবতা ও মমত্বের বীজ বোপিত হয়ে গেল। নাগা বিদ্রোহের ইঙ্গিত ও টুকরো ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক বিদ্রোহের প্রকৃতি ও ইংরেজ সরকারের নৃশংসতার স্বরূপ অংশত তুলে ধরলেও এই উপন্যাস শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নাগা অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক ভিন্ন পাঠ।

১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় নারায়ণ সান্যালের *দণ্ডক-শবরী* উপন্যাসটি। উপন্যাসের মূল শরীরে প্রবেশের আগে "কৈফিয়ৎ" অংশে লেখক স্বীকার করে নিয়েছেন (১৯৭৮) উপন্যাসে গোণ্ড সংস্কৃতির উপাদান তিনি গ্রহণ করেছিলেন গ্রীগ্‌সনের প্রামাণিক গ্রন্থ *The Maria Gonds of Baster* ও ভেরিয়ার এল্যুইনের *The Muria and theirs Ghotul* থেকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সরকারি কাজের সূত্রে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। *The Maria Gonds of Baster*-এর লেখক ডব্লু. ভি. গ্রীগ্‌সন ছিলেন ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত সেই সময়ের সেন্ট্রাল প্রভিন্সের অন্তর্গত দক্ষিণে বাস্তার-এর

প্রশাসক। ভেরিয়ার এল্যুইনকে তিনি আদিবাসীকেন্দ্রিক গবেষণায় সহায়তা করেছিলেন। ভেরিয়ার এল্যুইন একস্থানে স্বীকার করে নিয়েছেন, "সমগ্র রাজ্য জুড়ে আমি সফর করি; আর সংগ্রহ করতে থাকি প্রচুর তথ্য আর ফোটো; আবুঝমারের পাহাড়ি মারিয়াদের মধ্যে যাই হাতির পিঠে চেপে; এছাড়াও তথ্য ও ফোটো সংগ্রহ করতে গিয়েছি কোয়া, ভাত্‌রা, ডোর্‌লা ইত্যাদি আদিবাসীদের মধ্যে। কিন্তু মূলত আমার আগ্রহ নিবদ্ধ থাকে দুটি আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর – দক্ষিণের বাইসন-হর্ন মারিয়া আর উত্তরের মুরিয়াদের ওপর।"[১৫] নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই দুই গ্রন্থের উপাদানের সহায়তায় নারায়ণ সান্যাল যে উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণ করলেন, তাতে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সামান্য পরিচয় দিয়ে মূলত মুরিয়া গোষ্ঠীর জীবন–সমাজ-সংস্কৃতির সম্যক চিত্র তুলে ধরেছেন। এই দণ্ডকারণ্যের কথা আমরা রামায়ণেও পাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের "অরণ্যকাণ্ডে" আছে অত্রি মুনি রামচন্দ্রকে দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করার পরামর্শ দেন- "শুন রাম! রাক্ষস-প্রধান এই দেশ।/সদা উপদ্রব করে দেয় বহু ক্লেশ।।/অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্য স্থান।/ তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান।"[১৬] অবশ্য রামায়ণে উল্লিখিত দণ্ডকারণ্যের বিশালতা ও ব্যাপ্তি উন্নয়নের জোয়ারে আর তত নেই। কাহিনির মোড়কে মুরিয়াদের কথা বিস্তৃতভাবে জানালেও ঔপন্যাসিক অল্প পরিসরে আভাস দিয়েছেন মারিয়াদের জীবনের এবং মারিয়াদের কথা বলতে গিয়ে অবশ্যম্ভাবীভাবে এসেছে তাদের নাচের কথা- "এদের গোড়–নৃত্যকে আজ ভারত-বিখ্যাত বলা চলে।"[১৭] এদের নাচের ভঙ্গিটা হল মেয়েরা বৃত্ত করে ঘুরে ঘুরে নাচে আর বৃত্তের মধ্যে ছেলেরা ঘুরে ঘুরে মান্দ্রি ঢোল বাজায়। নৃত্যকালে পুরুষরা মাথায় ময়ুরের পালক দ্বারা সুসজ্জিত মোষের শিরস্ত্রাণ পরে। অনেকসময়ই এই শিরস্ত্রাণটি হয় পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত। মারিয়া পরিবারের কাছে এই শিরস্ত্রাণ মহামূল্যবান এবং যত্নের সঙ্গে রক্ষিত। পরিবার এর প্রতিটি অংশ আলাদা করে খুলে এর যত্ন ও রক্ষা করে এবং এই শিরস্ত্রাণের

কোনওরকম ক্ষতি তাদের কাছে অস্তিত্বের সংকটের ধারণার সঙ্গে যুক্ত। নৃত্যকালে ছেলেরা যখন শিরস্ত্রাণে সজ্জিত হয়ে ওঠে, তখন মেয়েরা নিজেদের সাজায় বিভিন্ন পুঁতির মালায়। পশ্চিমী ধ্যান-ধারণার মানদণ্ডে সভ্যতা মাপা মানুষ তখনও তাদের উন্মুক্ত বক্ষকে লজ্জা নিবারণের বস্ত্রে চাপা দিতে পারেনি বলে তাদের সেই উন্মুক্ত সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলত পুঁতির সাধারণ মালা। ভেরিয়ার এল্যুইন মারিয়াদের নৃত্য সম্বন্ধে লিখেছেন- "এই শিরস্ত্রাণ এবং তা মাথায় পরে নৃত্যই ছিল মারিয়াদের নান্দনিক চেতনার অভিপ্রকাশ। কারভিং বা খোদাইয়ের কাজ তারা করে না, ছবি আঁকে না, প্রাচীরে কোনো চিত্রকল্পও সৃজন করে না; প্রতিবেশী অন্যান্য মারিয়াদের মতো তারা সুন্দর সুন্দর চিরুনি বা তামাকের হুঁকোও বানায় না। অন্তঃস্থ সব অভিভাব ও শিল্পচেতনা তারা বাক্ময় করে তোলে তাদের নৃত্যে।"[১৮] এই মারিয়ারা "বাইসন-হর্ন মারিয়া" বলে পরিচিত।

মাড়াইযাত্রায় কথক দেখেছেন সুশৃঙ্খল মারিয়াদের (বা মাড়িয়াদের)। ভারতীয়ত্ব, ভারত সরকার বা জাতীয় সঙ্গীতের ধারণা না থাকা সত্ত্বেও তারা দলপতির নির্দেশে জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন উঠে দাঁড়ায়, সম্মান জানায়। প্রকৃতি ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষগুলোর অভাবের ধারণার সঙ্গে তথাকথিত সভ্যমানুষের চাওয়া-পাওয়া বা অভাববোধের ধারণা মেলে না। তাই সরকারি আধিকারিকের অভাব আছে কিনা প্রশ্ন তাদের বিস্মিত করে। আলো, জল ও জঙ্গলে খাদ্যের সংস্থানভিন্ন অন্য কোনও অভাব থাকতে পারে বলেই তারা জানে না। আর জানে না বলেই অনেকবেশি ''আছে''-তে ভারাক্রান্ত আমরা ওদের আনন্দে পৌঁছতে পারি না। অথচ ওদের নিজস্ব সংস্কারকে আমাদের পশ্চিমী ধার করা সংস্কৃতির ধারণা দিয়ে বিচার করতে চাই। তাদের কাছে বস্ত্র আবশ্যিক ছিল না, মারিয়া যুবতিরা ঊর্ধ্বাঙ্গকে গোপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি, লজ্জা অনুভব করেনি, সেই স্বাভাবিক চিরন্তন অনুভব থেকে, সংস্কার থেকে তাদের সরিয়ে এনেছে শহুরে সভ্যতার সংস্পর্শ। প্রসঙ্গত ঔপন্যাসিক

বোণ্ডদের এক গল্পের উল্লেখ করলেন যেখানে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র বোণ্ডদের সভ্য করে তুলতে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল কাপড়। গোষ্ঠীর নবীনরা কাপড় গ্রহণ করলেও আপত্তি জানিয়েছিল গাঁওবুড়ো। তাদের উপকথায় শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের কাপড় পরিধানের অভিশাপ ছিল। তাই গাঁওবুড়ো ভয় পেয়েছিল। বুড়োর ভয়কে সত্যি করে কাকতালীয়ভাবে বসন্তরোগের মহামারিতে উজাড় হয়ে যায় গ্রাম। গল্পটা সত্যি ছিল না নিছকই গল্প তার থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে এই প্রশ্নটা যে, প্রান্তিক সভ্যতার সংস্কারের বৈচিত্র্যকে মান্যতা দেব নাকি মূলস্রোতের আগ্রাসনে তাকে হারিয়ে যেতে দেব? স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে আদিবাসীদের উন্নতির পরিকল্পনায় এটিই ছিল মূল সমস্যার জায়গা।

সাহিত্যিক শুষ্ক নৃতত্ত্বের চর্চা করেন না বলেই উপন্যাসের মূল আখ্যানে লেখক মুরিয়া গোষ্ঠীর সমাজজীবন-বিশ্বাস-সংস্কারের পটভূমিতে আসলে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের ভালোবাসা ও ঘৃণার দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষ কাহিনিকেই গ্রন্থিত করেছেন। মুরিয়াদের পরিচয় দিতে গিয়ে Dr. S. T. Das বলছেন- "The name Muria has been derived from *mur*, the Flame of the Forest tree or from *mur*, a root.... *Mur* may also mean 'permanent', as in *mur podor*, a permanent or regular name as opposed to a mickname; the Muria in contrast to the Hill Maria have permanent settlement and dwellings."[১৯] মুরিয়া যুবক চন্দন, যুবতি মাল্‌কো ও রঙ্গিলার ত্রিকোণ সম্পর্কের মধ্যেকার ভালোবাসা ও ঘৃণাই এর মূল উপজীব্য। রঙ্গিলা নিয়ন্ত্রীশক্তি। মাল্‌কো নেহাতই বালিকা আর চন্দন তার সর্বশক্তি দিয়ে রঙ্গিলাকে আটকাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ। মুরিয়া সমাজ মূলত ঘটুলকেন্দ্রিক, মনে করা হয় মুরিয়া সমাজের আদি ও আদর্শ বীরপুরুষ লিঙ্গোপেনের সময় থেকেই এই ঘটুল প্রথা চলছে। প্রথম ঘটুল ও লিঙ্গোপেনের যে কিংবদন্তি মুরিয়া সমাজে প্রচলিত, তাতে প্রথম ঘটুলের যে বিবরণ মেলে তা এইরকম- "আদি ঘোটুল

সম্বন্ধে বর্ণনায় সেটি ছিল মোষের শিঙের মতো অনবদ্য, ঘোড়ার গলদেশের মতো অনুপম। তার ভিত অজগরের, খুঁটি গোখুরার; চালার কাঠামোটা বিষধর ভাইপার সাপে বাঁধা ক্রেইটের, আর ছাউনিতে ময়ূরের লেজ; বারান্দার ছাউনি বুলবুল পাখির পালকের; দেয়ালগুলো সব মাছের কাঁটা দিয়ে তৈরি; দরজাটা ছিল গাঢ় রক্তিম ফুলের মতো, আর সেই দরজার ফ্রেমটা ছিল রাক্ষসের হাড়ে তৈরি; মেঝেটা তৈরি ছিল বেসন দিয়ে; আর বসার জায়গাগুলো কুমিরের।"[২০] মুরিয়া গোষ্ঠীর সমস্ত অবিবাহিত যুবক–যুবতিই ঘটুলের সদস্য। ঘটুল মূলত দুই প্রকার- জোড়িদার ঘটুল ও নয়া ঘটুল। ঘটুলের সমস্ত পুরুষ "চেলিক" আর নারী "মোটিয়ারী" বা "মোতিয়ারি"। ঘটুলের প্রাচীন প্রথা ছিল বিবাহ-পূর্ববর্তী সময়ে একজন চেলিক ও একজন মোটিয়ারী জোড় বাঁধবে এবং পুরো সময় জুড়ে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবে। মুরিয়া সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকৃত। তবে ঘটুলের অপেক্ষাকৃত নতুন নিয়মে এই একগামিতার ধারণা খারিজ হয়ে যায়; বরং সেখানে থাকে সাম্যের ভাবনা। এই নতুন নিয়মে প্রতি চেলিক-মোটিয়ারী টানা মাত্র তিনদিনের জন্য জোড় বাঁধে। এক্ষেত্রে কোন্ চেলিক কোন্ মোটিয়ারীর সঙ্গে জোড় বাঁধবে, তা ঠিক করে ঘটুলের শিরদার বা বেলোসা। এই নিয়মে ঘটুলে কোনো চেলিক বা মোটিয়ারীর ওপর অন্য কোনো চেলিক বা মোটিয়ারীর অধিকার স্বীকৃত নয়। এই ব্যবস্থার জন্যই কুরূপ মানুষও তার প্রিয়তম ব্যক্তির শয্যাসঙ্গী হতে পারে। বিবাহিত হওয়ামাত্রই মুরিয়া যুবক বা যুবতিকে ঘটুল ত্যাগ করতে হয়। এই ঘটুলেই মুরিয়াদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনের ভাবনা গড়ে ওঠে। সামাজিক নিয়ম–কানুন, নিয়মানুবর্তিতা শেখে। পরিচ্ছন্নতার পাঠ পায়। ঘটুলের বড়ো সদস্যরা ছোটোদের এই পরিচ্ছন্নতা ও কাজের শিক্ষা দেয়। এভাবে সামাজিক বন্ধন ও গোষ্ঠীগত চেতনা গড়ে ওঠে। ঘটুলের সকল সদস্যই কোনো না কোনো পদের অধিকারী। ঘটুলের প্রধান "শিরদার" বা সায়দার, সম্ভবত এটা "সর্দার" শব্দের গোষ্ঠীগত উচ্চারণবৈচিত্র্য।

"বেলোসা" মোটিয়ারীদের মধ্যে প্রধান। বেলোসার অন্যতম কাজ হল ভোরবেলা ঘটুলের মোটিয়ারীদের ঘুম ভাঙিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া। "কোতোয়ার" মোটিয়ারীদের ঘটুলে উপস্থিতি তদারক করে। এছাড়া মুন্সি, বৈদার, দাফেদার, কাজাঞ্জি প্রভৃতি পদ রয়েছে ঘটুলের নানাবিধ কাজের তদারকির জন্য। এই দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে মুরিয়া যুবক-যুবতিরা জীবনের পাঠ পায় ও সামাজিক হয়ে ওঠে। চৈতদাণ্ডার উৎসবে বিভিন্ন গ্রামের ঘটুলের সদস্যরা মিলিত হয়ে আনন্দ করে, এইসময় তারা অন্য ঘটুলের সদস্যদের সঙ্গেও জোড় বাঁধতে পারে। মনে করা হয়, মুরিয়াদের পূর্বপুরুষ লিঙ্গোপেন বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। ফাল্গুন মাসে এমনই এক চৈতদাণ্ডার উৎসবে চয়ন-রঙ্গিলা-মাল্‌কোর পরিচয় হয়। কারাংমেটা ঘটুলের দল, রঙ্গিলা, মাল্‌কোরা সে বছর গিয়েছিল কাবোঙ্গার ঘটুলে। সে ঘটুলের "শিরদার" চয়ন। কথকের চোখে চয়ন যেভাবে ধরা পড়েছিল, তা এইরকম– "একনজর দেখেই আমি যেন মোহিত হয়ে গেলাম। ছেলেটির বয়স বছর কুড়ি-বাইশ হতে পারে। খালি গা, মালকোঁচা সাঁটা, ফরসা একটি ধুতি। গলায় একসার লাল-সাদা পুঁতির মালা। মাথায় হাতে-বোনা তাঁতের কাপড়ের উপর একটি নীলাভ শিখিপুচ্ছ। দু–হাতে দুটি ভারী দস্তার বালা। কিন্তু সাজপোশাক নয়, আমি দেখছিলাম মানুষটাকে। মুরিয়াদের মধ্যে অমন সুপুরুষ মূর্তি আমি খুব কম দেখেছি। যেন কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা ওর দেহ, তেমনি অপূর্ব মুখশ্রী। মনে হল সৃষ্টিকর্তা ছেনিহাতুড়ি নিয়ে ঐ পাথরে গড়া তনুদেহটি খুদে বার করেননি। তারুন্যের প্রতীক এ মূর্তিকে তিনি যেন মন্ত্রবলে সৃষ্টি করেছেন।"[২১] অনাদিবাসী মানুষের চোখে চয়নের রূপ এহেন মায়া তৈরি করলে মোটিয়ারীদের অবস্থা অনুমেয়। কিন্তু রঙিলা বা মাল্‌কোর সঙ্গে পরিচয়ের আগে পর্যন্ত চয়নের যৌবনের প্রতি ঔদাসিন্য ভাঙতে পারেনি কোনও মোটিয়ারী। শয্যাসঙ্গিনী হয়ে তারা চয়নের শুধু স্নেহের পরশটুকুই পেয়েছে।

রঙিলার অ-মুরিয়া সুলভ গায়ের সাদা রঙ, পিঙ্গল চুল ও নীল চোখ চয়নের যৌবনের ঘুম ভাঙিয়েছিল। কিশোরবয়সে চয়নের এক অনাদিবাসী মেয়ের প্রতি ভালোলাগা এবং আহত কিশোর হৃদয়ের বেদনার স্মৃতি ও ক্ষত দুইই রঙিলাকে দেখে জেগে ওঠে। অথচ চয়নের প্রতি রঙিলার ছদ্ম ঔদাসিন্য ও কোতোয়ারের বাহুবন্ধনে ধরা দেওয়ার ঘটনা চয়নের কিশোর বয়সের সেই অপমানের ব্যথাকে জাগিয়ে তোলে। অনাদিবাসী নারীর প্রতি ঘৃণায় চয়ন দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করে রঙিলার থেকে। ফলে, চয়নের এতদিনের সংযম ও বর্তমানের জাগ্রত যৌবন এবার বাঁধ ভাঙতে চায় লাজুক কিশোরী মাল্‌কোতে। চৈতদাণ্ডার উৎসবে এভাবেই বাকি চেলিক-মোটিয়ারীদের অগোচরে চলে রঙিলা-চয়নের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা, যা পরবর্তীতে তাদের জীবনের ঘটনাক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মাল্‌কোর সঙ্গে উৎসবে জোড় বাঁধার পর চয়ন বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে চয়নের বাবা যান কারাংমেটা গ্রামের প্রধান মাল্‌কোর পিতা আয়েতু গোণ্ডের বাড়ি। এ যাত্রা মুরিয়া রীতি অনুযায়ী "পুঙ্গার মিছানা" অর্থাৎ ফুলের চয়ন বা আহরণযাত্রা। মুরিয়া সমাজে "আকোমামা"-দের মধ্যে বিবাহে বাধা নেই। "আকোমামা" হল পালটি ঘর বা গোত্র। বিবাহের কথা স্থির হবার কালে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে "মধুক" নিবেদন করা হয় সিয়ারি পাতার ঠোঙায়। দেখা হয় এই কথা চলাকালীন অমঙ্গলসূচক কোনো চিহ্ন দেখা দিল কিনা! কাক, সাপ, ময়ূর বা গিরগিটি দর্শন অশুভের ইঙ্গিত, অন্যদিকে বাঁদিক থেকে আসা পাখির ডাক শুভ বলে বিবেচিত। বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে খানিক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। চয়ন বিয়ে করতে চেয়েছিল মাল্‌কোকে; অথচ চয়নের বাড়ি থেকে বিয়ে প্রস্তাব গিয়েছিল রঙিলার জন্য, রঙিলা মাল্‌কোর বড়োবোন। "লামহাদা" খাটতে গিয়ে চয়ন ব্যাপারটা উপলব্ধি করে এবং নিজের গ্রামে ফিরে আসে। "লামহাদা" হল মুরিয়া সমাজের এমন একটা প্রথা

যেখানে বিবাহের স্থির হওয়া থেকে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত হবু বর হবু স্ত্রীর বাড়িতে বেগার খাটে। ভেরিয়ার এল্যুইন জেনেছিলেন- "The chelik who goes to serve for his bride is called Lam or Lamhada in Gondi, Gharijiya in Halbi and Lamsena in Hindi. In the Central Provinces he is sometimes known as the Gahania- the boy who is in pawn. Elsewhere in India he is called Ghar-jamai, Ghandi-jawae, Ghar-damand and Khana-damand-these expressions mean 'house-son-in-law'. The Lamhada is betrothed to his girl in the ordinary way, and then comes to live in her father's house, where he is treated as one of the family".[২২] এই লামহাদা সময়কালে আগত চেলিককে গ্রামের ঘটুলের সদস্য হতে হয় এবং এইপর্বে হবু স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা, কথাবলা নিয়মবিরুদ্ধ। দু'বাড়ির পক্ষ থেকে ভুল শুধরে নেওয়া হয় ও মাল্‌কোর সঙ্গে চয়নের বিয়ে স্থির হয়। এই ঘটনা রঙিলাকে আরও ক্ষেপিয়ে তোলে। তীক্ষ্ণবাক্য ও আচরণের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায় চয়ন-মাল্‌কোকে। অতৃপ্ত যৌবনের ক্ষুধার যে আগুনে সে নিজে জ্বলছে, তাতে পুড়িয়ে ছারখার করতে চায় চয়ন-মাল্‌কোর সংসারের সুখস্বপ্নকে। শেষে এক দুঃস্বপ্নের রাত্রে রঙিলার ষড়যন্ত্রে আসকালোন ঘরে (যে ঘর মাসের বিশেষ দিনগুলোতে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ও পুরুষপ্রবেশ নিষিদ্ধ) চয়ন প্রবেশ করে ও ঘরের অন্ধকারে মাল্‌কো ভেবে রঙিলার শরীরে উত্তাপ খোঁজে। এই ঘটনার সাক্ষী থাকে স্বয়ং মাল্‌কো। চয়নের জীবনে এমন অনভিপ্রেত ঘটনার সুযোগে রঙিলা গোপনে বিয়ের প্রস্তাব দেয় চয়নকে। চয়ন তা শুধু ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানই করে না; রঙিলাকে "ডাইনি" বলে অপমানও করে। কারাংমেটার মুরিয়া সমাজে রঙিলাকে পেছনে সকলেই "ডাইনি" বললেও মুখের ওপরে এই অপমান রঙিলাকে হিংস্র করে তোলে, সে বলে "না রে, প্রাণে তোকে মারব না! একটি ধুরবানে

তোকে মেয়েমানুষ বানিয়ে দেব!''[২৩] আদিবাসী সমাজে ডাইনি বিশ্বাসের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে বলেছেন- "আদিবাসী সমাজে এই ডাকিনীবিদ্যা সম্পর্কে ধারণা এত গভীরভাবে রয়েছে যে, সহজে মুছে ফেলা যায় না এবং এ ধারণা তাদের জীবনের ছন্দকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে।''[২৪] যা কিছু বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও সন্দেহের ধোঁয়াশায় ছিল তাকে যখন রঙিলা স্বীকার করে নেয়, তখন চয়নের মধ্যে নিজের পুরুষত্বহীনতার ভ্রম জন্মে, সেই ভ্রম থেকে মানসিক বিকার ঘটে যায়। পাগল হয়ে যায় চয়ন।

মাল্‌কো এই ত্রিকোণ প্রেমের একটা রেখা হলেও তার সক্রিয়তা তেমন দেখা যায় না। চয়নের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে পর্যন্ত সে দিদির একান্ত অনুগামী মাত্রই ছিল, ঔপন্যাসিক লিখছেন- "সবাই ভালবাসতো মাল্‌কোকে তার মিষ্টি লাজুক স্বভাবের জন্য। আর মাল্‌কো সবচেয়ে ভালবাসতো তার দিদি রঙিলাকে। রঙিলার চেয়ে সে বছর তিনেকের ছোট। তাই দু'বোনের সম্পর্কটা প্রায় সখীত্বের পর্যায়ে পড়ে। তবে রঙিলার সাংসারিক জ্ঞান খুব বেশী, চালাক-চতুর সে– মাল্‌কো সরলা।''[২৫] অনাদিবাসী সমাজে যে ফর্সা রঙ, নীল চোখ অনুপম সৌন্দর্যের পরিচয়বাহক, আদিবাসী সমাজে তার কোনও মূল্যই নেই। তাই রঙিলা যখন গোণ্ড সমাজে গায়ের রঙ নিয়ে ঠাট্টার শিকার হয়, সেই বিদ্রূপের প্রতিবাদ করে মাল্‌কো। আবার মাল্‌কোকে ভালোবেসে জঙ্গলের কন্দ-মূল বা এটা ওটা এনে দিত রঙিলা। দু'বোনের এই ভালোবাসায় ততদিন চিড় ধরেনি যতদিন না তারা যুবতি হয়ে উঠেছে। পর পর দু'রাতে মাল্‌কো পেয়েছে দুটো কাঁকুই। পেয়েই দেখিয়েছে রঙিলাকে। সেই কাঁকুই ও মুরিয়া চেলিকদের উদাসীনতাই ঈর্ষার জন্ম দিয়েছে রঙিলার মনে। এই কাঁকুই নেহাতই কাঠের কাঁকুই। কিন্তু মুরিয়া যুবতির কাছে এর মূল্য অপরিসীম। এ শুধু তাদের কাছে কুমারিত্বের চিহ্নস্বরূপ নয়; যৌনতাকে অতিক্রম করে ভালোবাসার প্রতীক। মালকোর প্রতি রঙিলার ঈর্ষা আরও বেড়ে যায় চৈতদাণ্ডার

উৎসবে। চয়নের চোখে নিজের প্রতি মুগ্ধতা দেখেও মাল্‌কোর কাছে চয়নের আত্মসমর্পণ রঙিলা মানতে পারেনি। মাল্‌কোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে, বাক্যবাণে আহত করেছে, এখানে এই একটিবারই মাল্‌কো প্রতিবাদ করেছে- "মাল্‌কোকে যেন ভূতে পেয়েছে। যে রঙিলাকে সে বাঘিনীর মতো ভয় করে তাকে মুখের উপর বললে, না, যাব না।"[২৬] অবশ্য সেই প্রতিবাদও ক্ষণস্থায়ী। চয়ন এসে না পড়লে সে হয়ত রঙিলার কথা মতো ফিরেই যেত। চয়নের বাহুবন্ধনে মাল্‌কো নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে। কোথাও ব্যক্তি মাল্‌কোর পৃথক স্বর শোনা যায় না। এমনকি, চয়ন রঙিলার জন্য লামহাদা খাটতে এসেছে শুনেও তার কোনও অভিযোগ নেই, অথচ চৈতদাণ্ডার উৎসবে মিলনের রাতে সে চয়নের আচরণে শুধু জৈবতাড়না নয়; ভালোবাসার উত্তাপ পেয়েছিল। ফলে, কোথাও মনের কোণে চয়নকে পাবার আশাও জন্মেছিল। চয়ন-রঙিলার বিবাহের আয়োজনে লাজুক মাল্‌কো নিজেকে ভুল জেনে লজ্জা পেয়েছে, যে চয়নকে বারবার দেখতে চেয়েছিল তার সঙ্গে দেখা হবার কল্পনামাত্রে কষ্ট ও ভয় পেয়েছে। মাল্‌কো চয়নের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার বাসনাকে শুধু মনেই লালন করেছে, তার সেই ভালোবাসার উত্তাপ বা দ্বন্দ্বের প্রকাশ নেই। নিজের অজান্তেই সে রঙিলা ও চয়নের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মাঝের ঘুঁটি হয়ে যায়। যদিও শেষ পর্যন্ত রঙিলার ঈর্ষার তীব্রতা ও ষড়যন্ত্র মাল্‌কোকে জিতিয়ে দেয়; চয়নের সঙ্গে সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

রঙিলা এই আখ্যানের মূল চালিকাশক্তি। সে মুরিয়া সন্তান নয়, জিপসি কন্যা। যাযাবরের রক্ত তার শরীরে। আয়েতু-আখালীর যৌবন বয়সে কারাংমেটায় ছাউনি ফেলে একদল জিপসি। বিয়ের পাঁচবছর পরে তখনও আখালী নিঃসন্তান। সে শোনে জিপসিদের কোনো এক মেয়ের বাচ্চা হয়েছে। আখালীর নিঃসন্তান নারী হৃদয়ের বাৎসল্য তাকে দেখেই জেগে ওঠে। ক্ষুধার্ত সেই কন্যাকে সদ্য মা হওয়া মোরাঙ বউয়ের বুকের দুধ খাইয়ে আনে সে। হয়তো নবজাতক সেই কন্যার মা তাকে জন্ম দিয়েই

মারা গেছে, তাই তাকে খাওয়ানোর জন্য এক জিপসি মেয়ে তাদের শরণাপন্ন হয়েছিল। পরেরদিন দেখা যায় জিপসির দল সেখান থেকে ছাউনি গুটিয়ে চলে গেছে অন্য কোথাও, ফেলে গেছে সেই দুধের শিশুকে; হয়তোবা দিয়ে যেতে চেয়েছিল আখালীর কাছেই। সেই শিশুই রঙিলা। গুনিয়া নিদান দেয় পিঙ্গলবর্ণা ও নীল চোখের এই কন্যা আসলে বিষকন্যা, ডাইনি। সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও আয়েতু ও আখালী তাকে বুকে করে মানুষ করে। গুনিয়ার ওপর দেবতা আঙ্গোপেনের ভর হয় জানে বলেই গুনিয়ার সেদিনের সেই কথাকে মুরিয়া সমাজ ভোলে না। তাই বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রঙিলা বোঝে সে মুরিয়াদের আপন নয়। সকলের কুসংস্কারগ্রস্ত মনের মধ্যে রঙিলা ডাইনি হয়েই বাড়তে থাকে। নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে সে ঘটুলের সর্বোচ্চ পদ পেলেও কোনও চেলিকের ভালোবাসার উত্তাপ সে পায় না। সে জানতে পারে, বুঝতে পারে চেলিকরা তার শয্যাসঙ্গী হয়ে ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রাত্রিযাপন করে। কোনও কাঁকুই সে পায় না। নারীত্বের অপমানে ক্রোধের আগুনে জ্বলতে থাকে সে। চায় সেই আগুনে ভালোবাসার ঘটুলকে পুড়িয়ে দিতে। কিন্তু ক্ষান্ত হয় এ কথা ভেবে যে তাহলে তার ডাইনি অপবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে। অথচ রঙিলার মধ্যেও এমন একটা নারীসত্তা আছে, "যে ভালবাসতে চায়, যে ভালবাসা পেতে চায়"।[২৭] অথচ অকারণেই তার সেই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে মুরিয়া সমাজ, মুরিয়া যুবকের উদাসীনতায় নারীত্বের অপমান ঘটেছে রঙিলার। সে বুঝেছে, যে রূপে অনাদিবাসী সমাজ মুগ্ধ, সেরূপের মূল্য মুরিয়া সমাজে নেই। মুরিয়াদের মধ্যে প্রথম সে চয়নের চোখে মুগ্ধতা দেখেছিল, চয়নের পৌরুষের মধ্যে ধরা দিয়ে রঙিলা এতদিনের তার নারীত্বের অপমানকে ভুলতে চেয়েছিল। ভেবেছিল বাধা পেয়ে চয়নের কামনাকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে পারবে, তাই কোতোয়ারের বাহুবন্ধনে সে ধরা দিয়েছিল। কিন্তু নিয়তির অন্যকিছু ইচ্ছে ছিল। রঙিলার ছদ্ম উদাসীনতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা চয়নের মনে ফর্সা মেয়েদের

বিশ্বাসহীনতার ধারণাকেই পোক্ত করে, ফলে রঙিলাকে অস্বীকার করে চয়ন মাল্‌কোর কাছে নিজেকে ধরা দেয়। এই সবকিছুই ধীরে ধীরে রঙিলাকে ক্ষেপিয়ে তোলে, অথচ মাল্‌কোর সঙ্গে প্রথম দিকে বোনের সম্পর্কে, চয়নের প্রতি ভালোবাসা প্রমাণ করে রঙিলা খানিক খরজিহ্বা হলেও তার একটা নারীমন আছে, দেহজ কামনা আছে। অসুস্থ অবস্থায় মোহনের দ্বারা ধর্ষিতা রঙিলা প্রবল আক্রোশে তাদের শিরদারকে সবকিছু জানায় ও মোহনকে খুঁজে শাস্তি দিতে বলে। কিন্তু, থানা-পুলিশ সম্পর্কে ভীত অন্যান্য আদিবাসীদের মতই শিরদারও ভয়ে পিছু হাঁটে। ক্ষত-বিক্ষত রঙিলা সেদিন নিজেকে ডাইনি বলে স্বীকার করে ও মোহনের উদ্দেশ্যে ''ধুরবান'' ছোঁড়ে। রঙিলার নিজেকে ডাইনি বলে মেনে নেওয়ার মধ্যে একধরনের অসহায়তা ছিল। কাকতালীয়ভাবে মোহনের মুখে কুষ্ঠ হয় এবং মুরিয়া সমাজে রঙিলা প্রকৃতই ডাইনি হয়ে ওঠে। ছোটোবেলা থেকে রঙিলা আশেপাশের মানুষের মুখে ''ডাইনি'' শুনে বড়ো হয়েছে, তারপর প্রিয় মানুষদের থেকে মা আখালী, বোন মাল্‌কোর মুখে ডাইনি শুনে আহত হয়েছে; অতঃপর ভালোবাসার পুরুষ চয়নের মুখে সেই একই অপবাদে সে নিজেকে ডাইনি বলে স্বীকার করে নেয়। তারপর হারিয়ে যায় মুরিয়া সমাজ থেকে। হতভাগ্য জিপসি কন্যা ভাগ্যের পরিহাসে শেষপর্যন্ত হয়তো যাযাবরই হয়ে গেল।

নারায়ণ সান্যাল মানবমনের নিগূঢ় রহস্যের উন্মোচন ও মানবপ্রেমের আখ্যান রচনা করতে গিয়ে সহায়ক উপাদান ও পটভূমি হিসেবে মুরিয়া সংস্কৃতির অংশবিশেষ টুকরো টুকরো করে তুলে এনেছেন। চৈতদাণ্ডার উৎসব ছাড়াও মুরিয়া সমাজে পৌষকুলাঙ উৎসব প্রচলিত। এই উৎসবে অংশ নেয় শুধুমাত্র ছেলেরা। ''উইজ্জা-ওয়েতা'' হল শিকার উৎসব। শিকারের দেবতা কাদরেঙ্গাল। শিরদারের নেতৃত্বে চেলিকরা শিকারে যায় এবং শিকারের প্রথম মাংস উৎসর্গ করা হয় দেবতা কাদরেঙ্গালকে। শিকার পরবের পরেই আসে ''উইজ্জা-পাণ্ডাম'' বা জমিতে বীজ বোনার উৎসব।

এছাড়া জানুয়ারি মাসে হয় ভীমূল পাণ্ডাম, বৃষ্টির দেবতার পুজো, মার্চে ইরপু পাণ্ডাম, মহুয়া গাছের উৎসব, মারকা পাণ্ডাম আমের উৎসব ও তিল খানি তৈল বীজের উৎসব। মুরিয়াদের বিয়ে হয় ভিন্নগোত্রে বা ‘‘আকামামা’’ শ্রেণিতে। দাদাভাই বা সগোত্রে বিবাহ মুরিয়া সমাজে নিষিদ্ধ। কেউ এই বিবাহ করলে তাকে সমাজচ্যুত হতে হয়- “All the clans within one phratry are dadabhai, or brother, to one another, and all the members of each clan are dadabhai to each other. The word used to describe the relation of a clan into which you can marry your daughter is *akomama*, a combination of the words *ako*, which means a man’s mother’s father, daughter’s son and daughter’s daughter (all of whom will belong to a different clan in a different phratry), and *mama*, which means a man’s mother’s brother, his father-in-law and his wife’s brother’s son (who will again, of course, be members in different clans’’[২৮] বিবাহের সময় পাত্রীর গোত্রান্তর হয়। এইধরনের সমস্ত অনুষ্ঠানেই মুরিয়ারা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে মধুক উৎসর্গ করে এবং বিবাহের সমস্ত কিছুই বিজোড় সংখ্যার হতে হয়। মুরিয়াদের মধ্যে ছয় প্রকার বিবাহরীতির প্রচলন আছে, যথা- ওস্তাসানা মারমি, তাক দায়না, আরউইতানা, হাইওয়াক ওয়াৎ, তিকা তাসানা ও ইয়ার দোসানা মারমি। মুরিয়া সমাজে বউয়ের বড়োবোন বা আকোইনের সঙ্গে ভগ্নীপতির ও ভাশুর-ভাদ্রবউয়ের মধ্যে ‘‘নিষেধের সম্পর্ক’’। মৃত্যুর পর মুরিয়ারা মৃতদেহ দাহ করে। উপন্যাসে যে কাবোঙ্গা গ্রামের কথা রয়েছে তার পরিচয় মেলে ভেরিয়ার এল্যুইনের *The Muria and Their Ghotul* গ্রন্থে- “Kabonga is a village in north-central

Kondagaon."[২৯] ঔপন্যাসিক এই গ্রন্থ থেকে মুরিয়াদের সাংস্কৃতিক চর্চাকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে নিপুণ দক্ষতায় মিলিয়ে দিয়েছেন মানবমনের ভালোবাসা, ঘৃণা ও দ্বন্দ্বকে।

আদিবাসী জীবন, সমাজ, সংস্কৃতির সঙ্গে জঙ্গল বা অরণ্যের সম্পর্ক আজন্ম। সমরেশ বসু *দুই অরণ্য* (১৯৬৩) উপন্যাসে একদিকে যেমন সারান্দার জঙ্গলের ও সেই জঙ্গলের সঙ্গে লগ্ন থাকা মুণ্ডা-ওঁরাওদের জীবন-বিশ্বাস-সংস্কার, তাদের ওপর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ছবি তুলে ধরলেন, তেমনই অন্যদিকে কলকাতা শহর ও শহরের মানুষের প্রেক্ষিতে মনের গহন অরণ্যের অন্ধকার ও শ্বাপদের হিংস্রতায় অন্য আরেক অরণ্যের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুললেন। উপন্যাস আবর্তিত চেকো মুণ্ডাকে কেন্দ্র করে। চেকোর জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময়পর্বের মধ্যে দিয়ে লেখক তুলে এনেছেন মুণ্ডাদের সৃষ্টিতত্ত্ব, দেব-দেবী, উৎসব ও ডাইনি মেয়ে বাবোস মুণ্ডানির প্রসঙ্গ। চেকোর মাতামহী বৃদ্ধ গোমো মুণ্ডার মুখে শোনা যায় তাদের জগৎ তৈরির ও জগতের দুঃখের, পাপের উৎসের রূপকথা– "হুঁ, আমাদের রূপকথায় বলে, ঠাকুর বলে নাকি একজন মহাদেবতা ছিলেন। তিনি কচ্ছপকে হুকুম করেছিলেন, সমুন্দর থেকে মাটি তুলে নিয়ে আসতে। সেই মাটি তুলে তুলে জগৎ তৈরি হল। সেই জগতে বুরু-জঙ্গল চেয়ে কী সুন্দর হল। কিন্তু আ! আহা, ঠাকুরের মন কাঁদে, বড় একলা লাগে। তা গাছ থেকে একদিন দুটো মানুষ বানালেন-একটা কোড়া, একটা কুড়ি।"[৩০] সেই নর-নারীর শারীরিক ব্যবধান রাখলেন মধ্যে একটা সরু ডাল দিয়ে। কিন্তু চালের তৈরি মাণ্ডি ও মাণ্ডি থেকে তৈরি ডিয়াং রস খেয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়লে, তাদের মধ্যেকার সেই সরু ডাল তুলে নেন মারাং বুরু। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঠাকুরের নিষেধাজ্ঞা অমান্যজনিত পাপ করে। পৃথিবীতে নরনারী সেই পাপের ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করে। এই রূপকথা, উপকথার শিকড় মুণ্ডা জীবনে এমনভাবে গ্রথিত যে মায়ের দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে রোজার প্রতি তীব্র আকর্ষণে চেকোর বারবার মারাংবুরুর ডাল সরিয়ে নেওয়ার

কাহিনিই মনে পড়ছিল– "হে মারাংবুরু! আমার আর রোজার মাঝখানে করমের ডাল সরিয়ে নিয়ো না। আমরা এক মায়ের পেটে জন্মেছি। আ-। মানুষ কী অসহায়।..."[৩১] অন্যদিকে গোমো মুণ্ডার মতো মুণ্ডারা বিশ্বাস করে "ডিয়েং" ছাড়া বাইরের চোলাই তাদের কাছে অপবিত্র। "ডিয়েং" মারাংবুরুর দান বলেই তাদের পুজো, বিয়ে ইত্যাদি সমস্ত কাজে লাগে। মহুলের রস বা "সাড়গা"ও তাদের কাছে পবিত্র। বাইরের চোলাই প্রত্যাখ্যানের প্রসঙ্গেই এসেছে বিরসা মুণ্ডা ও মুণ্ডা আন্দোলনের কথা। বিরসার প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে অরণ্যনিধনকে কেন্দ্র করে। ফরেস্টগার্ড হয়ে চেকো দেখেছে কীভাবে অবৈধভাবে বনবিভাগের সরকারি কর্মচারীদের সহায়তায় গাছ কাটা আর চালান চলে, অথচ আদিবাসী বিরহড়দের সামান্য চীহড়ের লতা উপড়ে নেওয়ার অধিকার নেই, যা দিয়ে শক্ত দড়ি বানিয়ে তারা জীবিকা অর্জন করতে পারে। চেকো প্রতিবাদ করতে চায়, কিন্তু সাহসের অভাবে পারে না। তাই ফরেস্ট রেঞ্জার হয়ে ক্ষমতাবলে বেআইনি গাছ কাটা বন্ধ করতে পড়াশোনা করে, ইংরেজি শেখে। অল্পকথায় ঔপন্যাসিক ভাষার সাম্রাজ্যবাদ দেখিয়েছেন – "পরীক্ষা দিতে হবে ইংলিশ কথায়, অথবা হিন্দিতে। মুণ্ডা-মুণ্ডারি কথায় পৃথিবীতে কখনও কোনও পরীক্ষা হয়নি, হবেও না।"[৩২] মুণ্ডা সমাজের ও এলাকার তিনটি স্থান বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন নির্মলকুমার বসু তাঁর *হিন্দুসমাজের গড়ন* গ্রন্থে– সারনা, সসান(বা সাসান) এবং আখড়া।[৩৩] সারনা হল মুণ্ডাদের দেবস্থান। উপন্যাসে গোমো চেকোকে সারনায় পুজো দিতে বলেছে। সসান বা সাসান হল মুণ্ডা সমাধিক্ষেত্র। মুণ্ডারা যে আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী, উপন্যাসে সেই বক্তব্য পাওয়া যায়- "আত্মা অবিনশ্বর, এইটাই মুণ্ডাদের বিশ্বাস। এবং মরণের পর সে নতুন দেহ ধারণ করে। মানুষ, পাখি, মাছ, পশু বা গাছ।"[৩৪] আখড়া হল যেখানে মুণ্ডা স্ত্রী-পুরুষ মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করে। উপন্যাসে "জংখ এরপা"র কথা আছে, এটা আদিবাসীদের নিজস্ব শিক্ষালয়। নাচ-গান-হাতের কাজ-শিকার-সামাজিকতা

সব কিছুই এখানে তারা শেখে। শুধু তাই নয়, গ্রামের উৎসবে বা বিপদে এগিয়ে আসবার শিক্ষাও তারা এখানেই লাভ করে। চেকো ও মাংরির বিয়েকে কেন্দ্র করে মুণ্ডাদের বিবাহ-রীতি ও আচার উঠে এসেছে। এদের বিবাহের মণ্ডপ বা মারোয়া তৈরি হয় কলাগাছ ও খেজুরের পাতা দিয়ে। বিবাহে মেয়েকে হাত ধরে টেনে আনাই নিয়ম। বিবাহের আচারের মধ্যে সিঁদুর পরানোই প্রধান সংস্কার বা অনুষ্ঠান। পুরোহিতের উপস্থিতিতে সিঁদুর দানের মধ্যে দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এরপর নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে আমোদ চলে। স্বল্প পরিসরে লেখক মুণ্ডাদের মাঘে-পরব ও বা-পরবের কথা তুলে ধরেছেন আর করম পরব আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র রায় লিখছেন- "This festival is celebrated on the day of full moon(Purnima) in the month of *Pous* (January). The Mundas call the month of *Pous* by the name of Mage, and the month of 'Magh' by the name Gola Mage. The spirits of deceased ancestors – the household gods of the Mundas- are the main objects of worship at this festival."[৩৫] মাঘে-পরব মুণ্ডা নর-নারীর অবাধ প্রণয়ের পরব বলে উল্লেখ করেছেন লেখক। মাঘে পরবের পর মুণ্ডাদের ফুলের উৎসব "বা-পরব"। চৈত্র মাসে শাল গাছে ফুল ধরলে সারনাতে পুজো দিয়ে এই উৎসব পালন করে মুণ্ডারা। পরবর্তী উৎসব করম পরব। কিন্তু করমের আগেই চেকোর জীবনে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। স্ত্রী গর্ভবতী মাংরি মারা যায় ভালুকের আক্রমণে। এরপরই চেকোর জীবনে ও উপন্যাসে বাঁক বদল হয়। কলকাতাকে তার মনে হয় "ইমারতের সারান্দা"। লেখক বোঝান সেই ইমারতের সারান্দাতে মানুষরূপী হিংস্র শ্বাপদেরাও থাকে, সে অবাক হয় কলকাতার নানা চেহারায়। কোথাও মানুষের জন্য খাদ্য আন্দোলন, কোথাও মানুষই বিক্রি হয় অর্থের বিনিময়ে, বিক্রি হয় শরীর, প্রেম। সে তার স্ত্রীকে জঙ্গলের পশুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি, কিন্তু আরেক নারীর মর্যাদা মানুষের

পশুত্ব থেকে রক্ষা করতে পেরেছে। এভাবে গভীর ব্যঞ্জনায় সমাপ্ত হওয়া উপন্যাসে চেকোর জীবনকে ঘিরে ঔপন্যাসিক খণ্ড খণ্ড চিত্রে মুণ্ডাদের সমাজ, সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

মুণ্ডা সমাজ ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণে আধুনিকের সঙ্গে প্রাচীনের চিরকালীন দ্বন্দ্বের কাহিনিকে তুলে ধরলেন বুদ্ধদেব গুহ *সাসান্‌ডিরি* (১৯৯০) উপন্যাসে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বিশ্বায়নের জেরে মুণ্ডা কৌম সমাজে ঢুকে গেছে আধুনিকতা। তবে এই আধুনিকতা বস্তুগত, সির্‌কা যাকে মুণ্ডাদের লোভ হিসেবেই দেখতে চায়। প্রাজ্ঞ সির্‌কা মুণ্ডা সমাজের সামাজিক রীতি-নীতিতে বিশ্বাস রেখেই আধুনিকতাকে সমর্থন করতে চায়। আসলে, মানুষের স্বাধীনতা, মেয়েদের কথা বলার অধিকারই সির্‌কার চোখে আধুনিকতা। অথচ, চাটানের কাছে আধুনিকতা হল টিভি, কম্পিউটার বা যে কোনো বিলাসের জিনিসের ওপর অধিকার। বিশ্বায়ন বিশ্বজুড়ে যে বাজার ও চাহিদা তৈরি করেছে, তা একধরনের সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ তৈরি করে। বিশ্বায়নের রাজনীতিতে মুণ্ডা সমাজ নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভুলতে বসে। ক্ষমতাশালী কেন্দ্রিক বা মূলস্রোতের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুণ্ডা সংস্কৃতিকে আগলে রাখার ও না রাখতে পারার ক্ষোভ উপন্যাসজুড়ে। এই উপন্যাসে নানাভাবে এসেছে বিরসার প্রসঙ্গ। মুণ্ডা বিদ্রোহের নায়ক মানুষ বিরসা মুণ্ডা সংস্কৃতিতে ভগবান হয়ে ওঠেন। মানুষ ভগবান হয়ে উঠলে তিনি শুধু মূর্তি হয়ে যান বা জুড়ে যান পূজার আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে। তাঁর আদর্শ ও পথ ভুলে যায় নবীন মুণ্ডারা- "ঐ খুঁটি থেকে সাইকোর মধ্যেই বাঁদিকে পড়ে উঁচু সুকান্‌বুড়ু পাহাড়। সেই পাহাড়ে বীরিসা ভগবানের মন্দির বানানো হয়েছে। প্রতি বছর মাঘী–পূর্ণিমার দিন ওখানে মস্ত মেলা বসে। উৎসব হয়। বহু দূর দূর থেকে মুণ্ডা আসে।"[৩৬] লড়াইয়ের ইতিহাস সংস্কৃতির অংশ হয়ে যায়। বিরসার আদর্শ ও লড়াইয়ের তাৎপর্য নবীনরা ভুললেও একথা ঠিক মুণ্ডারা বিরসাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের গানে, যে গান তাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ। লিখিত ইতিহাস নেই বলেই মুণ্ডারা তাদের

ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত করে দেয় গান ও লোককথার মধ্যে দিয়ে। সির্কার গানে উঠে আসে সোনা–রূপার মতো তাদের "দিশুম" বা দেশ ছোটোনাগপুরের কথা, গানের ভাবটা এইরকম– "আমাদের দেশ, এই ছোটোনাগাপুরা, সোনার মতো, রূপার মতো, এই ছোটোনাগাপুরা দুধ আর মধু চোঁয়ায়; খাদ্য-পানীয়র অভাব নেই কোনোই এই দিশুম্-এ। ভাইবোনেরা যারা দূরে গেছে তাদের সকলকে ডেকে নাও তোমরা, ডেকে নাও এই দুধ আর মধুর রাজ্যে।"[৩৭] এই গানে দিশুম্ ছেড়ে চলে গেছে যারা, তাদের প্রতি ফিরে আসার আহ্বান আছে। কিন্তু সির্কা যে দেশের গান গেয়েছে, সেই দেশ আসলে তাদের পূর্বপুরুষদের ফেলে আসা সময়। সেই দেশে থাবা বসিয়েছে অনাদিবাসী মানুষের লোভ। শ্বাপদসঙ্কুল নিশ্ছিদ্র জঙ্গলের "দিশুম"ও তাদের আর নেই। চাটানের মনে হয়, "এখন সেই পূর্বপুরুষ আদিবাসীদের দিশুম্ আর তাদের নেই। "দিকু"রাই মালিক সব কিছুর। সব কেমন নতুন নতুন দেখায়। এমনকি চাটান্দের শিশুকালেও কত অন্যরকম ছিলো এই সব জায়গা। স্বভূমি বলে মনে হতো। এখন আর মনে হয় না। মনে হয়, ওরাই 'দিকু' আর অন্যরা মুণ্ডা।"[৩৮] গানের মধ্যে দিয়েই বা গানে-গানেই মুণ্ডাদের ঈশ্বর বন্দনা, দেব-আখ্যান, সখীদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপচারিতা, প্রেম-প্রস্তাব ও প্রেমময় প্রত্যাখ্যান।

উপন্যাসজুড়ে মুণ্ডাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি, অনুশাসন, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের রীতিনীতি। তাদের বিশ্বাস ও গড়ে ওঠা সংস্কারজুড়ে আসলে ঈশ্বরচেতনা। স্বর্গে সিঙবোঙা ও নীচে সিঙবোঙা কর্তৃক সৃষ্ট পঞ্চায়েত মুণ্ডা সমাজের অনুশাসন ধরে রাখেন। "আল" বা সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মুণ্ডা জীবন। যে মুণ্ডা সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কোনও বাধা নেই, বিশেষত, নারীর সঙ্গী নির্বাচনের মতো স্বাধীনতা রয়েছে, সেই সমাজও পরপুরুষ পরনারীর সংস্রবকে মহাপাপ বলে মনে করে। জাতিচ্যুত করে। জাতিচ্যুত ব্যক্তি মুণ্ডা সমাজের কাছে অতীত হয়ে যায়। নিজেদের গোষ্ঠী

বা কিলির[৩৯] মধ্যে যৌন সম্পর্ক মুণ্ডারা স্বীকার করে না, যেমন স্বীকার করে না "সাকামচারি" বা বিবাহবিচ্ছেদ না করে অন্য সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া। উস্‌কির সঙ্গে সাকামচারী না করেই চাটান মুঙ্গরীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে। মুণ্ডা সমাজে বিবাহ সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গেও জড়িয়ে ঈশ্বরভাবনা। তারা মনে করে "মুণ্ডাদের বিয়েও তো ঠিক হয় স্বর্গেই।" [৪০] আচার দ্বারা মুণ্ডা সমাজে সেই বিয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। ছেলেকে পণ দিতে হয় না; বরং মেয়েকেই সম্মান দিয়ে আনতে হয়, মুণ্ডা ছেলেকে বিয়ের সময় মেয়ের বাবাকে দিতে হয় দুটো বলদ আর মেয়েকে আটটা শাড়ি। বিয়ের ভোজ খাওয়াতে হয় পুরো গ্রামকে, সঙ্গে হাঁড়িয়া। সারারাত নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের মত জন্মের পরেও মুণ্ডা সমাজ কিছু আচার পালনের মধ্যে দিয়েই নবজাতককে সমাজভুক্ত করে, "চাট্টি উৎসব" তার মধ্যে অন্যতম- "On the eighth day after child-birth, the purification ceremony of the new-born baby and its mother is performed."[৪১] মুণ্ডারা সিঙবোঙাতে বিশ্বাস করার সঙ্গে সঙ্গে "রোয়া" বা মুয়া ভূতেও বিশ্বাস করে। সিঙবোঙা মুণ্ডাদের কাছে সর্বশক্তিমান শক্তি, যার আশীর্বাদ তারা সব অনুষ্ঠানেই প্রার্থনা করে। মৃত্যুর পর মৃতের ছায়া বা "উম্বুল" নিয়ে আসে "ওরা-বোঙা" করে যত্নে বাড়িতে রাখার জন্য। উপন্যাসজুড়ে মুণ্ডা সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পটভূমিতে আসলে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের অবক্ষয় এবং ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক সংকটের মুখোমুখি মুণ্ডা সমাজের ছবি তুলে ধরলেন লেখক। চাটান্‌দের মতো মুণ্ডা যুবকেরা প্রাচীন সির্‌কাদের মতো মুণ্ডা সমাজের রীতি-নীতি কঠোরভাবে পালন করতে চায় না, সাকামচারী না করেই মুঙ্গরীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, মুণ্ডা সমাজের বাইরে গিয়ে বৃহৎ অনাদিবাসী সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে চায়, মিশে যেতে চায় মুণ্ডাত্বকে অস্বীকার করেই- "আমাদের মধ্যে যারা টাটা কোম্পানির কারখানায় এমনকি এই সব ছোটখাট লাহি কারখানাতেও কাজ করে তাদের অবস্থাও কি আমাদের চেয়ে ভালো

নয়? তাদের পাকা বাড়ি, ট্রানজিস্টার, সাইকেল। ঘরে ঘরে ফ্যান, বিজলি আলো, সাদা-কালো টিভি। তারা কি আমাদের চেয়ে সুখী নয়?"[৪২] মুণ্ডা সংস্কৃতি মূলধারার অনাদিবাসী ভারতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হয়, সির্‌কা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে- "আমরা ভারতীয় হবো বলেই আমাদের মুণ্ডাত্ব বিসর্জন দিতে হবে কেন? আমাদের যা-কিছু নিজস্ব সব কিছুই বাঁচিয়ে রেখে তো আমরা ভারতীয় হতে পারি।"[৪৩] মূলস্রোতের আগ্রাসনের বিপ্রতীপে সির্‌কা শুধু মুণ্ডা নয়, সব প্রান্তিক সংস্কৃতির পক্ষের প্রতিবাদের মুখ হয়ে যায় এইভাবেই।

মুণ্ডা লোককথায় "দিশুম" তৈরির কাহিনি এইরকম- "In the beginning of Time, the face of the Earth was covered over with water. Sing Bonga, the Sun-God, brooded over the waters and the first beings that were born were a *Kachua* or tortoise, a *Karakom* or crab, and a *Lendad* or leech. Sing-Bonga commanded these first-born of all animals to bring Him a lump of clay (*hasa*) from out of the depths of the primeval Ocean. The tortoise and the crab by turns tried their skill, but in vain. The persistent leech, however, met with better success. It succeeded in fishing out a bit of clay from underneath the deep. And with this clay, Sing-Bonga made this *Ote-Disum.*"[৪৪] সেই দেশ গাছ-পালায় ছাওয়া শান্তির দেশ। অথচ বহিরাগত ব্যবসায়ী ও নবীন মুণ্ডাদের লোভ মুণ্ডা বাসস্থান ও সংস্কৃতিকে সংকটের মুখে টেনে আনে। নিশ্ছিদ্র জঙ্গল আর তাদের নেই, গাছের দর তোলে ঠিকাদাররা আর অর্থের লোভে গাছ বিক্রি করে দেয় মুণ্ডারা। ছায়াহীন হয়ে যায় দিশুম্, হয়ে যায় সাসানের মতো দিশুম্। বনের মানুষ বনের অভাবে, শিকারের অভাবে নিঃস্ব হয়ে যায়। ফলে, মিশে যেতে চায় শহরে। অথচ শহরে কুলি-কামিন হওয়া

ভিন্ন অন্য কোনও পথ নেই। স্বাধীন মানুষগুলো অধীনতা মেনে নেয়, মেনে নিতে বাধ্য হয়। মুণ্ডা সংস্কৃতি ভুলে তারা কুলি–কামিনের সংস্কৃতির চর্চায় মাতে।

মুণ্ডাদের জীবনচর্চায় আগুনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জন্মমাত্রেই শিশুকে মুণ্ডা সমাজ গ্রহণ করে না। "চাট্টি উৎসবের" মধ্যে দিয়ে নবজাতক মুণ্ডা সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই উৎসবে আগুনের উত্তাপের মধ্যে দিয়েই শিশু ও মাকে পবিত্র করে গ্রহণ করা হয়। যে মাদুরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেই মাদুর পুড়িয়ে ফেলা হয়। মৃত্যুতেও মৃতদেহকে আগুন জ্বালিয়ে মন্ত্র পড়ে তবে কবরস্থ করা হয়। মুণ্ডা লোককথাতেও আগুন পবিত্রতম, ঈশ্বরের প্রতিভূ। কারণ স্বয়ং হারাম নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিলেন আগুনের পর্দার আড়ালে। হারাম বিশ্বাসী মুণ্ডারা তাই সব অনুষ্ঠানে আগুন জ্বালায়। মুণ্ডা লোককথায় লোভ ও অনাচাররোধে আগুনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর ধ্বংসের কাহিনি আছে, লোভে মত্ত হয়ে মানুষ যখন পৃথিবীকে, সুন্দর জীবজগৎকে নষ্ট করতে উদ্যত হয়, তারা যখন ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে চায়, তখন হারাম আগুনের বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেন- "Mankind (*Horo honko*, the sons of man) threw off their allegiance to Sing Bonga. Sing Bonga thereupon sent a warning to men on Earth through His servent-bird '*Kaua Bhandari*' (crow, the steward) and *Lipi Susari* (Lipi, the cook). But men refused to obey Sing Bonga. Enraged at the impious contumacy of man, Sing Bonga showered down on the Earth below a terrible rain of fire to destroy mankind."[৪৫] উপন্যাস জুড়ে লেখক মুণ্ডা সমাজ ও সংস্কৃতির সংকটকে প্রতীকায়িত করলেন এই মিথেরই প্রসঙ্গ ধরে। প্রাচীন সির্‌কা নবীন মুণ্ডাদের লোভের মধ্যে সেই প্রায় আগত ধ্বংসকেই যেন প্রত্যক্ষ করেন। বারবার সাবধান করেন চাটান্‌কে। কেন্দ্রীয় মূলস্রোতের প্রতি অতিমাত্রায় আকর্ষণ ও

মুণ্ডা রীতি-নীতিকে ঐতিহ্যের কঙ্কাল আঁকড়ে ধরার সঙ্গে তুলনা প্রমাণ করে মুণ্ডা সমাজ নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি আস্থা হারাচ্ছে। এই জাতিচ্যুত হওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রবণতাই মুণ্ডা সমাজে প্রচারিত ধ্বংসের লোককথায় রূপকায়িত। চাটান্-মুঙ্গরী সামাজিক অনুশাসন ভেঙেছে। সাকামচারী না করেই চাটান্ মুঙ্গরীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে, মুঙ্গরীর সম্মতিতেই। উভয়ে শুধু একই "কিলি"র মধ্যে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে তাই নয়, রক্তের সম্বন্ধের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, আর সেই সম্পর্কসূত্রে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছে মুঙ্গরী। জঙ্গলের সঙ্গে খনিজ উত্তোলনের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক। খনিজ উত্তোলন করতে গেলে জঙ্গল কেটে ফেলতে হয়। চাটান্ সেই সোনা খুঁজে চলেছে শাবল দিয়ে, অথচ জঙ্গল মুণ্ডাদের কাছে মাতৃস্বরূপ। সেই শিকড়ের কথা ভুলেছে চাটান্। সির্কা বলে- "সোনাও তো লৌহ-আকরিকের মত। আমরা যদি গাছ না কাটতাম, অনাচার না করতাম, জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রাখতাম তবে এই খরা আদৌ আসতো না।"[৪৬] ঔপন্যাসিক যেন মুণ্ডা মিথলজিতে বিশ্বাস রেখেই সামাজিক অনুশাসনভঙ্গকারী, জাতিচ্যুত প্রেমিক-যুগলের ওপর হারামের ক্রোধের আগুন নামিয়ে আনলেন প্রাকৃতিক দাবানলের মধ্যে দিয়ে, সোনা খুঁজতে গিয়ে দাবানলে উভয়ের নৃশংস মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসজুড়ে মানুষের কথা আছে, সে সির্কার আক্ষেপ ও ভয় হোক, মুঙ্গরীর ভালোবাসাজনিত দ্বন্দ্ব হোক, চাটানের উস্কির সঙ্গে ঘর ভেঙে যাওয়ার দুঃখ হোক বা প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্ব হোক। তবু উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রধান হয়ে ওঠে মুণ্ডা রীতি-নীতি, সংস্কার, বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাস ভেঙে পড়ার ইঙ্গিত ও শাস্তি। মানুষের ভালোবাসাকে ব্রাত্য করে সমাজ-অনুশাসন ভাঙার ভয়ংকর পরিনতির ইঙ্গিতেই উপন্যাসটি শেষ হয়ে যায়। বুদ্ধদেব গুহ *শালডুংরি* (১৯৮৮) উপন্যাসে মুণ্ডা জীবনের পরিমণ্ডলের মধ্যে এক সাহেবী কেতার মানুষের এক মুণ্ডা রমণীকে বিয়ে করে মুণ্ডা হয়ে ওঠার যাত্রা,

আধুনিকতার মেকি আড়াল ছিঁড়ে ফেলার দার্শনিক অভিব্যক্তির প্রকাশই মুখ্য। তাঁর *কোয়েলের কাছে* (১৯৭০) উপন্যাসে ওঁরাও জীবনের আভাস আছে মাত্র।

সাসান্‌ডিরি উপন্যাসে সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদকে অস্তিত্বরক্ষার সঙ্গে জুড়ে মানুষের চাওয়া-পাওয়া ও ভালোবাসাকে ব্রাত্য করা হয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধদেব গুহ *পারিধী* (১৯৭১) উপন্যাসে উড়িষ্যার কন্দ জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবেশে মানুষের ভালোবাসাকেই মুখ্য করেছেন। উত্তমপুরুষে লেখা এই উপন্যাসে কথকের প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা যেমন রয়েছে, তেমনই আছে চন্দ্রকান্তের প্রতি কন্দ মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, চন্দনীর অবুঝ প্রেম আর চন্দনীর প্রতি বলরামের উন্মত্ত সুগভীর ভালোবাসার প্রসঙ্গ। আর এই প্রেমের সুবেষ্টনীর মধ্যে লেখক সুনিপুণভাবে এঁকে দিয়েছেন কন্দ সংস্কৃতি ও জীবনচর্চাকে। ''পারিধী''র অর্থ মৃগয়া। উড়িষ্যার রাজাদের এককালে মৃগয়া বা পারিধীকে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করলেন অন্য জীবনদর্শনে। জীবনব্যাপী বহু অনিচ্ছুক কর্মের একঘেয়েমির ক্লান্তি আমাদের ভীত ও সংকুচিত করে, চন্দ্রনাথ নিজ ইচ্ছার জীবন বেছে সেই একঘেয়েমির শিকারের সাধনায় রত থেকেছে। সুখের অন্য অনুভব আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে গেছে নিরন্তর। চন্দনীর সঙ্গে বিয়েতে নিমরাজি চন্দ্রকান্ত সে সাধনায় শেষপর্যন্ত সাফল্য পেয়েছিলেন কিনা ঔপন্যাসিক তা পরিষ্কার করেননি বটে, তবে সাধারণ মানুষের কাছে অন্য ভাবনার জগৎ খুলে দিয়েছেন।

উপন্যাসে উড়িষ্যার অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠী কন্দ বা কন্ধ বা খন্দর জীবন ও সংস্কৃতির খানিক পরিচয় মেলে। ''কন্দ'' শব্দের উৎস তেলুগু শব্দ ''কন্দা'' (konda)-র অর্থ হল পাহাড় বা পাহাড়ি লোক। অবশ্য কন্দ গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের ''কুই লকু'' (kui loku) বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ''কুই''(kui) অথবা ''কুভি'' (kuvi) ভাষায় এরা কথা বলে।

উপন্যাসে পাই- "সৌমেনবাবু বলছিলেন, কন্দ কথাটার ব্যুৎপত্তি একটি তামিল শব্দ থেকে। কিন্দ্রি একটি তামিল শব্দ। তেলুগুতে তাকেই বলে কন্ডা। কিন্দ্রি মানে পাহাড়, ছোট পাহাড়। এবং কন্ডা মানে পাহাড়ী লোক। যে অঞ্চলে কন্দরা বাস করত সেই পুরো অঞ্চলটাই খন্দ্‌মাল বলত।"[৪৭] কন্দ সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা স্বীকৃত ও নারী সম্মান রক্ষার প্রতি সমাজ দায়বদ্ধ। স্পর্শ বলতে শুধু চামড়ার স্পর্শ নয়, চাহনির স্পর্শ ও তার সু বা কু'ও তাদের কাছে বিচার্য। উপন্যাসে পাই–"...এই বিরিগড়ের গরীব অর্ধনগ্ন কন্দ পুরুষদের কাছ থেকে আমাদের টেরিলিনে-আবৃত শহুরে পুরুষদের শেখার অনেক কিছু আছে। এদের দেখলে মাথা নুইয়ে আসে। যেসব লেখা-পড়া জানা ভাল চাকরী-করা শহুরে ভদ্রলোক বাসের ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে হায়নার মত ভদ্রমহিলাদের চোখ দিয়ে লেহন করেন এই কন্দরা সেই চাউনি কোনোদিন দেখতে পেলে টাঙ্গি চালিয়ে ধড় থেকে তাদের মুণ্ডু আলাদা করে দিত।"[৪৮] সমাজে আচরণের ক্ষেত্রে কঠোর অনুশাসন বলবৎ আছে। সমাজের প্রধান রয়েছেন- তারা "কাহান", "মালিক" নামেও পরিচিত। সমাজের প্রধান কঠোরে-কোমলে সমাজের অনুশাসন ও ঐক্য বজায় রাখেন। মুণ্ডা সমাজের গিতিওরা বা শোনেঘরের মতো কন্দ সমাজেও অবিবাহিতদের জন্য ঘুমোবার ঘর বা Dormitory ব্যবস্থা আছে- "Grown up girls sleep together and spent most of their time in their dormitory known as 'dhangerddu' or Dhanger basa. One old woman is in charge of the girls' dormitory. Likewise for unmarried boys separate dormitory provided. When boys and girls attain the age of seven or eight they start their dormitory life."[৪৯] উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কন্দ গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসকের বিশেষ নজরে আসে তাদের মেরিয়া বা নরবলি প্রথার জন্য। মেজর জন ক্যাম্পবেল সাহেবকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই নৃশংস

প্রথার অবসানের জন্য। ১৩ বছরের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত এই প্রথা বিলুপ্ত হয়। অনাদিবাসী ও সমতলের লোকেরা ছোটো ছোটো ছেলেদের ধরে কন্দদের কাছে বিক্রি করে দিত। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তারা প্রভুদের বাড়িতে প্রভুদের অধীনে থাকত। প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বলি দেওয়া হত। মেরিয়া রক্ত বা বলির সঙ্গে আসলে যুক্ত ছিল কন্দদের রোগমুক্তির ধারণা। কন্দ পুরোহিতদের বলা হয় ''জানি'', ''জানকার'', ''দেহুরি'' প্রভৃতি। কন্দসমাজে বহু দেবদেবীর পুজো স্বীকৃত। ''পেনু'' অর্থে দেব বা দেবী। তারা মনে করে ডারনী বা ডারেনী পেনু বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন। ইনি গ্রামের রক্ষয়িত্রী এবং ''টানা পেনু'' নামেও পরিচিত। পাথররূপে পূজিতা। কন্দরা এনার পুজোয় শূকর বলি দেয়। এছাড়াও কন্দ সমাজে আরও যে সমস্ত দেব-দেবী পূজিত হন, তাঁরা হলেন সারু পেনু, সুগা পেনু, পিজু পেনু, পিলানু পেনু, জরি পেনু, সশি পেনু, বুরা পেনু, সিরি পেনু, গাম্বেরু পেনু, বুদেলি পেনু প্রমুখ। জঙ্গলের দেবতা ''মউলি''-কে বিশেষ ভয় ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে কন্দরা। কন্দ সমাজের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন ও আচার-অনুষ্ঠানের আভাস উপন্যাসে পাওয়া যায়। জন্মের প্রায় মাসখানেক পরে নবজাতকের মাথা মুণ্ডিত করে, পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে মোরগ বলি দিয়ে ও পূজা-অর্চনার মধ্যে দিয়ে অশৌচ ভাঙা হয়। কন্দরা আত্মার অবিনশ্বরতা ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। তাই এই পূজা-অর্চনার সময় গ্রামের পুরোহিত একটা ধনুক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে নবজাতকের বাড়ির সামনে এবং শিশুটির পূর্বপুরুষের নাম বলে যান। যে নাম উচ্চারণের সময় ধনুকটি কেঁপে ওঠে, মনে করা হয় সেই পূর্বপুরুষের আত্মাই উত্তরসূরি হয়ে ফিরে এসেছে। নবজাতকের ঘরে অশুভ আত্মার প্রবেশ আটকানোর জন্য সেই গৃহের চারদেওয়ালে মোরগের রক্ত লেপে দেওয়া হয় এবং মোরগের রক্তমাখা গাছের ছাল ঘরের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়। পূজা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নবজাতক কন্দ সমাজভুক্ত হয়। কন্দ সমাজে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা থাকলেও বিবাহের

ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত বিধি-নিষেধ আছে। একই গোষ্ঠীভুক্ত ছেলে ও মেয়ে বিয়ে করতে পারে না। রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এমন নারী-পুরুষের মধ্যেও বিয়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ- "Marriage with a kinsman is prohibited. The tribe is divided into different septs. Marriage is not possible within the same sept or with a girl of the mother or paternal grandmother's sept. But one can marry a girl belonging to his maternal grandmother's sept."[৫০] কন্দসমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকৃত। মৃত্যুর পর শবদেহ উত্তরে মাথা ও দক্ষিণে পা করে রাখা হয়, *সাসানডিরি*-তে পাই মুণ্ডারা মৃতদেহ কবর দেয় উত্তরে পা আর দক্ষিণে মাথা রেখে। কন্দরা মৃতদেহ দাহ করে। তবে গর্ভাবস্থায় কেউ মারা গেলে বা একমাসের কম বয়সী শিশু মারা গেলে তারা সেই দেহ কবর দেয়। গর্ভবতী মেয়ে মারা গেলে কবর দেওয়ার সময় মৃতদেহের হাঁটুর কাছে লোহার টুকরো পেরেকের মত ঢুকিয়ে দেওয়া নতুবা লোহার চামচ বুকে বেঁধে দেওয়া হয়। কন্দরা বিশ্বাস করে গর্ভাবস্থায় কেউ মারা গেলে সে পেত্নি হয়ে যায়। মুণ্ডাদের মধ্যেও একইরকম প্রথা দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় কোনো মুণ্ডা মেয়ে মারা গেলে তার হাত-পা দুমরে–মুচড়ে ভেঙে উল্টো করে কবরে শোয়ানো হয়।[৫১] উপন্যাসে পাহাড়ের ওপরে সহজ–সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কন্দ সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তথাকথিত সভ্যমানুষের চতুরতা নেই; লজ্জা, গান ও বিশ্বাসে তারা ভেসে যায়। আর যায় বলেই প্রথা ভেঙে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মানুষ চন্দ্রকান্তের সঙ্গে, যিনি কিনা কন্দ সমাজভুক্ত নন, চন্দনীর বিয়ে দেয়। ঔপন্যাসিক সংস্কারের অন্ধ আনুগত্যের ওপর আধুনিকতা ও মানুষের জয়ধ্বনির সুর বুনলেন উপন্যাসজুড়ে।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক বিমল সিংহ তাঁর *লংতরাই* (১৯৮৪) উপন্যাসের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন ত্রিপুরার অন্যতম আদিবাসী জনগোষ্ঠী রিয়াং সম্প্রদায়ের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের চিত্র। এই

বৃত্তের মধ্যে আরও ধরা পড়েছে রিয়াং সমাজের রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও সর্বোপরি জীবন-জীবিকার সংগ্রাম। কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যেও রিয়াংদের জীবনে গান ও সুরের অভাব ঘটে না বলেই *লংতরাই* উপন্যাসের অনেকটা স্থান জুড়ে আছে রিয়াং সমাজে প্রচলিত গান। হরিভূষণ পাল তাঁর *'৪৩–এর রিয়াং বিদ্রোহ ও রতনমণি* গ্রন্থে লিখছেন ত্রিপুরার সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী "ত্রিপুরী"। এই জনগোষ্ঠী শুধু সংখ্যায় বৃহৎ নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকেও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর থেকে উন্নত। ফলে, ত্রিপুরার সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। "অন্যদিকে, জনসংখ্যার বিচারে দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি সম্প্রদায় রিয়াংগণ ছিল সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক অবহেলিত। বিশেষ করে ত্রিপুরীদের তুলনায় রিয়াংরা ছিল অ-নে-ক পেছনে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। রাজধানী বা সমতল এলাকা থেকে দূরবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করার কারণে রিয়াংগণ রাজ্য প্রশাসন, উন্নত বাঙালি সমাজ বা অগ্রণী ত্রিপুরীদের সংস্পর্শে আসতে পারেনি। রাজ আনুকূল্য থেকেও তারা ছিল বঞ্চিত।"[৫২] রিয়াংদের সম্পর্কে এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের (১৩১০ ত্রিপুরা) স্বাধীন ত্রিপুরা সেন্সাস রিপোর্টে- "রিয়াংগণ শিক্ষা ও অবস্থাদিতে ত্রিপুরজাতীয় অপরাপর সম্প্রদায় হইতে হীন। ইহারা অতিশয় মদ্যপায়ী। সুধু পানসক্তি হেতু ইহাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা অতীব শোচনিয়। ইহারা জুম কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে; কদাচিৎ কেহ ব্যবসায় বাণিজ্যও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সঞ্চয়শীলতা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অর্থ সঞ্চয় হইলেই ইহারা বিবাহ কিংবা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ব্যয় সহকারে সম্পন্ন করে, কিম্বা "মেলা" বসাইয়া সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় করে। বিবাহাদি উপলক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে স্বজাতীয় লোকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দেওয়াকে "মেলা বসান" বলে।"[৫৩] সমাজতাত্ত্বিক যে দৃষ্টিতে সমাজকে দেখেন, ব্যাখ্যা করেন, ঔপন্যাসিক তেমনভাবে করেন না। ঔপন্যাসিকের দেখার

পরিসরজুড়ে থাকে মানুষ, তার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা। এই উপন্যাসে রিয়াং জনগোষ্ঠীর জীবন-সমাজ-সংস্কারকেই শুধু লেখক তুলে আনেননি, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উপন্যাসে রিয়াংদের জীবন ও সংস্কারকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক প্রধান চরিত্র জরকামুনি ও সাজেরুঙ-এর প্রেম ও বিবাহকে কেন্দ্র করে। উপন্যাস শুরু হয় রিয়াংদের জুমচাষের একটা কর্মব্যস্ত দিনের মধ্যে দিয়ে। যৌথশ্রম প্রথায় রিয়াংরা গভীর অরণ্যে অস্তিত্বের সংগ্রাম করে। জরকামুনি ও অন্যান্যরা একসঙ্গে তিলক্ষেতে কাজ করে। শুধু মাত্র যৌথশ্রম বা যৌথচাষ নয়, রিয়াং যুবকরা একসঙ্গে থাকে গ্রামের মাঝখানে টংঘর "দোয়াইনক"-এ, "যুবক ছেলেরা এখানে রাত্রে থাকে। প্রত্যেকের বিছানাপত্র সাজিয়ে রাখা সামরিক শিবিরের মতো। ঘরের ভিতরে বাদ্যযন্ত্র রাখে সিম্বাক নামক মাচার উপর। চমপ্রেঙ (পাহাড়ি গীটার) সুমুল (বাঁশের বাঁশী) খাম (পাহাড়ি মাদল)। যৌথ চাষ বা যৌথ শ্রমের সূচনা হয় এদের জীবনে দোয়াইনক পরিবেশ থেকে। বাঁশের পাখা ছোটবড়ো খাড়া, চেঙপাই, মেয়েদের কাপড় বুনার যন্ত্র, চুলের কাঁটা যা হরিণের পায়ের হাড় দিয়ে তৈরী, সিরিং মানে বাঁশের চিরুনী। সবকিছুই যুবকরা বানায় এই দোয়াইনকে বসেই।"[৫৪] রিয়াং জীবনের সঙ্গে লগ্ন থাকে দারিদ্র্য। জ্যৈষ্ঠমাস থেকে শুরু হয় রিয়াং ঘরে ঘরে অভাব। মুরগি ও শুয়োরের শূন্য কুঠুরি সেই দারিদ্র্যের নিদারুণ সংকেত। কাঁঠাল দানা ও কচু সেদ্ধ দিয়ে কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা রিয়াং ঘরে ঘরে। লংতরাই পাহাড় সংলগ্ন অরণ্য হয়ে ওঠে রিয়াংদের শেষ অবলম্বন। গভীর অরণ্য থেকে তারা খুঁজে আনে বন্য লতা-পাতা, বুনো গোটা, বনডুমুর, ভাতের স্বাদের কুঙ্গা আলু, সাদা বন আলু বা খাখুই। প্রকৃতির দানে দীর্ঘসময়ের জন্য অভাব বা খিদে দূর হয় না, ফলে অনেকে চলে যায় সড়কের কাজে, বর্ডার রোড মেরামতির কাজে। কিন্তু সেখানেও কাজে নাম লেখাতে গেলে ঠিকাদারকে ঘুষ দিতে হয়। এই কারণে অনেকে এই কাজও নিতে পারে না, কারণ ঘটি-বাটি বন্ধক

রেখে টাকা জোগাড় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না অনেকের পক্ষেই। কেউ কেউ এই কাজে আসে না মাসের শেষে মজুরি পাবার কারণেও। সারা মাসের খোরাকের ব্যবস্থা তাদের নেই। ফলে, অনেকে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু সেই ঋণ পরিশোধের সময় মহাজনদের শোষণের শিকার হতে হয় রিয়াংদের। শুধু দারিদ্র্য নয়, রিয়াংদের লড়াই করতে হয় বুনো হাতি এবং সরকারি বনদপ্তরের নিপীড়নের সঙ্গেও। প্রবল দারিদ্র্যের দিনে রিয়াংরা লংতরাই পাহাড়ের চূড়ো থেকে নেমে আসা নদীর বুকের শেওলা ধরা পাথর সংগ্রহ করে, কারণ রাস্তার কাজের জন্য সেই পাথর কেনে ঠিকাদাররা। আরও অনেকের সঙ্গে জরকামুনির বাবা রংকারায় সেই পাথর সংগ্রহের কাজে গিয়ে না ফিরলে হাতির আক্রমণে বাবার মৃত্যুর আশঙ্কা গ্রাস করেছিল জরকামুনিকে। এই প্রসঙ্গে তার মনের মধ্যে ভিড় করে হাতির আক্রমণে নৃশংস মৃত্যুর স্মৃতিরা। রাতেরবেলা ঘুমন্ত গ্রামে ঢুকে আক্রমণ চালায় দাঁতাল, বাকিরা পালাতে পারলে টংঘরের ছোট্ট এক শিশু পালাতে পারেনি- "শুড় দিয়ে জড়িয়ে আছড়ে আছড়ে মেরে ডলে ডলে চেপ্টা পিঠার মত বানায়। অনেকক্ষণ সেই রক্তাক্ত পিঠা শুড়ে নিয়ে পিঠ চুলকিয়ে লুঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে। সেই নৃশংস দৃশ্যটা মনে হতে না হতেই জরকামুনির সারা পায়ে কাঁটা ফোটে। পায়ের চলা টাল মাটাল। বুকটা আতঙ্কে হিম হয়ে আসছে। আবার মনে হয় আরো বীভৎস তারই দূরসম্পর্কের মামীর নৃশংস মৃত্যুর কথা।"[৫৫] জঙ্গল পরিষ্কার করে জুম চাষ রিয়াংদের জীবিকার মূল অবলম্বন, দারিদ্র্যে অরণ্য হয়ে ওঠে আশ্রয়ের মতো, অথচ সেই জঙ্গলের আশ্রিত সেই মানুষগুলোর অধিকার কেড়ে নিতে উদ্যত বনদপ্তর- "বাজারে বাজারে ঢোল পিটিয়ে ফরমান জারী করে জুম কাটা নিষেধ। বাঁশ, ছন, কাটা নিষেধ। বনজ সম্পদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয় একটা চিরকূট কাগজের মতো নোটিশ দিয়ে। নিষ্ঠুর আইনের হাড়িকাঠে জবাই শুরু হলো লংতরাই পাহাড়ের অসহায় জুমিয়াদের। দা, কুড়াল কেড়ে নিল জুমিয়াদের হাত থেকে।"[৫৬] ধরা পড়লে শুধু দা, কুড়ুল

কেড়ে নেওয়া হয় না, অনেকসময় চালান করে দেওয়া হয় কোর্টে। গরীব রিয়াংরা ছাড়িয়ে আনার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে আরও নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

অরণ্যেঘেরা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে বলে রিয়াংদের জীবনে প্রকৃতি বিস্তৃত অংশ জুড়ে থাকে। যে দাঁতালের হিংস্র আক্রমণে মারা গেছে পরিচিতেরা, তাকেই রিয়াংরা ‘‘লংতরাই বাবা’’ বানিয়ে তোলে। দেবতার জন্মের সূত্র মেনেই রিয়াংদের জীবনে হাতিটি হয়ে ওঠে ‘‘অলৌকিক’’। ‘‘স্বয়ং দেবতা। গুলি করলেও মরে না। বহু শিকারীর হাতের নিশানা ব্যর্থ করে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। ওই হাতীটার চলার পথ দুর্গম থেকে লোকালয় বা লোকালয় থেকে দুর্গম অরণ্য। যে নারী বন্ধ্যা, ওই হাতীর পূজো দিলে নাকি সন্তান পায়। ওই হাতীকে স্বপ্নে দেখলে জুমের ফসল দ্বিগুণ হয় সে বছর।’’[৫৭] এভাবেই রহস্যময় ক্ষমতাবান প্রকৃতি অসহায় মানুষের জীবনে, বিশ্বাসে দেবত্ব পায়, তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে নানা কল্পকথা। প্রকৃতির নৈকট্যের কারণে প্রকৃতির সঙ্গে রিয়াংদের যে একাত্মতা গড়ে ওঠে তা তাদের প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে লগ্ন হয়ে থাকে-

- য়ংচরিং পতঙ্গের ডাক জুম চাষ করা রিয়াংদের কাছে তিল, কার্পাস ফোটার সময়ের বার্তা।
- রিয়াংরা বিশ্বাস করে চিংচং পাখি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। ওরা বাসা বাঁধে পাহাড়ি নদীর খাড়া পাড়ে। আগামীর বর্ষা বা খরার খবর পায় সেই পাখি, তেমন করেই বাসার উচ্চতা নির্মাণ করে। আর সেই বাসার উচ্চতা দেখে রিয়াংরা বোঝে সেবার বর্ষা হবে না খরা।
- চিলের মতো বড়ো ও নিশাচর ওয়াং পাখি ডাক রিয়াংদের কাছে অমঙ্গলের বার্তাবহ। মৃত্যুর বার্তা নিয়ে আসে এই পাখি।

এছাড়া, রিয়াংরা অলৌকিকত্ব, দৈবী বা জাদুমন্ত্রে বিশ্বাসী। জাদুবিদ্যার সাহায্যে কাউকে মেরে ফেলা যায় বা প্রেমে ও বিবাহে অনিচ্ছুক পাত্রীকেও সম্মত করানো যায় বলে বিশ্বাস করে। উপন্যাসে

বিদ্যাজয় সেই জাদুমন্ত্র জানে বলেই জরকামুনি বা বাকিরা বিশ্বাস করে। রিয়াংরা বিশ্বাস করে বিদ্যাজয়ের বাবার ছিল জাদুমন্ত্রের বিপুল জ্ঞান আর সেই "মন্ত্রের গুণে বড় বড় গাছ পাতা ঝড়িয়ে শুকনো ডালপালা নিয়ে রাখতে পারতো। শুয়োরের বড় মাংসের টুকরা সেদ্ধ করতো। সেদ্ধ টুকরার ভেতরে কাঁচা মাংসের টুকরো মন্ত্র পড়ে ঢুকিয়ে দিতো।"[৫৮] আর সেই মাংস খেয়ে অসুস্থ দবারামকে বাঁচানো যায়নি। রিয়াংরা বিশ্বাস করে বিদ্যাজয়ের বাবা জাদুমন্ত্র দিয়ে মেরে ফেলেছিল দবারামকে। এই অন্ধবিশ্বাসের গ্রাস এড়াতে পারে না জরকামুনিও। মনে মনে ভেবে রাখে সাজেরুঙ তার ভালোবাসার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে, সে বিদ্যাজয়ের জাদুমন্ত্রের সাহায্য নেবে। অরণ্য রিয়াংদের জীবনের প্রতিদিনকার অংশ হলেও তাকে ঘিরে রিয়াংদের মনে রহস্য কমে না; তারা বিশ্বাস করে গভীর অরণ্যে বিভিন্ন শব্দে বনদেবতা বা অপদেবতা মানুষকে ভোলায়- "কেউ বলে বনের মধ্যে পরিচিত গলায় দেবতারা নাম ধরে ডাকে। ওই সব অপদেবতার পাল্লায় পড়লে রক্ষা নেই। রহস্য ভরা লংতরাই পাহাড়ের রাত বিচিত্র অলীক কাহিনী জীবন্ত হওয়ার জন্য উদ্যত।"[৫৯] শুধুমাত্র বনদেবতা নয়, রিয়াংরা আরও অনেক দেবতা ও অপদেবতাতে বিশ্বাস রাখে। উপন্যাসে "বুড়াসা দেবতা"-কে পাই। জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে এই দেবতার ঘনিষ্ঠ যোগ। সমাজে মৃত্যু হলে রীতি মেনে এই দেবতাকে অভিশাপ দেয় গ্রামের বয়স্করা। এছাড়া পাই "লাউতাউ" দেবতাকে, যিনি বিপরীতে রিয়াংদের মৃত্যুকে ঠেকানোর জন্য সংগ্রাম করেন। রিয়াং উপকথায় এই লাউতাউ বা "নাপুকে অচাই" হল মন্ত্রজানা পুরোহিত- যার মৃত্যু হয়নি, কিন্তু ঘটনা প্রবাহে তিনি দেহহীন। সেই দেহহীন "নাপুকে"র প্রাণ এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে বলে রিয়াংররা বিশ্বাস করে। এছাড়া রিয়াং সমাজে নদীপূজা ও অঞ্চলদেবতার পূজা প্রচলিত। স্বাধীন ত্রিপুরা সেন্সাস রিপোর্টে রিয়াংদের যে সমস্ত দেব-দেবীর পরিচয় মেলে, তা হল-

১। মতাই কতর, ২। তুইমা, ৩। গরাই ও কালাই, ৪। সংগ্রমা, ৫। বুড়াছা, ৬। বালী রাও এবং থু নাই রাও, ৭। খুলংমা, ৮। মাইমংমা, ৯। বুড়ীরক, ১০। লাম্পারা।[৬০] এইসমস্ত দেবতারা ঘিরে রাখে রিয়াংদের- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনকে।

জরকামুনি ও সাজেরুঙের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগের আভাস দিয়ে উপন্যাসের শুরু। আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা ও প্রেমজনিত ঈর্ষায় সেই অনুরাগ গাঢ় হয়। জরকামুনির বাবা রীতি মেনে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যায় সাজেরুঙের বাড়ি। এইসময় পাত্রের যাওয়া রীতি নয় বলে জরকামুনি সঙ্গে যায় না। আন্দ্রা বা বরপক্ষ প্রথা মেনে সঙ্গে নেয় কাছিম শিকারে ব্যবহৃত বল্লম ও দা। এই বল্লম বিবাহের সূচনার ইঙ্গিত বহন করে। পাত্রীর বাড়ির উঠোনে এই বল্লম পুঁতে বিবাহের কথাবার্তা শুরু করা হয়। কনের বাড়ির লোককে আপায়্যনের জন্য বরপক্ষকে নিতে যেতে হয় মদ। বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রীর যোগ্যতা বিচার করা হত জুমের কাজে নিপুণতা দিয়ে। কাপড় বোনা ও তুলো ধোনা দক্ষতার সঙ্গে করলে পাত্রী যোগ্য বলে বিবেচিত হত। পাত্রীর ঘরের পরিবেশ দেখে তাদের পরিশ্রমী বা অলস বলে চিহ্নিত করাও রিয়াং সমাজে প্রচলিত- "আন্দ্রারা কনের বাড়ী ভালো করে লক্ষ্য করেছে। রামকলার বিচিত্র মালা চোখে পড়ে কিনা, নতুন তৈরী কাপড় ঘরে কেমন সাজানো-সব লক্ষ্য করেছে। চরকায় মাকড়সার জাল লেগে আছে কিনা, আন্দ্রারা তখন বুঝতে পারবে মেয়েটা তাহলে অকর্মণ্য। উঠানে ধানের গোলা কতো বড় বা সাংসির উপর মাচায় বেলের মুচি কত বেশি আছে; সমাপ্ত-অসমাপ্ত বাঁশের খাড়া কতোটি– ঘরের মানুষ আদৌ অলস না কর্মঠ, ধনী বা গরীব-এসব দেখেই আন্দ্রারা বুঝতে পারে।"[৬১] বিয়ে ঠিক হওয়া বা "কৌসুমবা ওয়াখাকাইব"-এর পরে বিয়ের অনুষ্ঠান বা "সুইখেমো"। সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের আশীর্বাদ ও সম্মতি নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিবাহস্থলে কনে থাকে না, প্রতিনিধি হিসেবে থাকে একটা বক্ষ আবরণী। বিবাহের সমগ্র

অনুষ্ঠানের আচার ও রীতিতে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত সামগ্রীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। চাল রিয়াংদের কাছে মহামূল্যবান বলেই সেই চালের ভাতকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা হয়। এছাড়া তুলো, তেল, মরিচ, লবণ ও জলের মূল্য ও গুণকে মানদণ্ড করে দাম্পত্য জীবনের সুখ ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। এভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়। অন্যান্য আদিবাসীদের মতো রিয়াং সমাজে কন্যাপণ নেই, কিন্তু "জামাই খাটা" প্রথা আছে। এই প্রথা অনুসারে বিয়ের পর পরই বরকে স্ত্রীর পিতৃগৃহে বাস করতে হয়। ত্রিপুরার অন্যতম আদিবাসী সম্প্রদায় ত্রিপুরী সমাজেও "জামাই খাটা" প্রথা আছে। বরের এই শ্বশুরবাড়িতে বাস করাকে তারা বলে "চামারি কাছা"। বিজয় কুমার দেববর্মণ তাঁর *ত্রিপুরার উপজাতি বিবাহবিধি উৎসব ও পূজা পার্বণ* গ্রন্থে লিখছেন "বরের করণীয় কর্তব্য হলো ঘরের নানাবিধ কাজ থেকে শুরু করে জুম বা কৃষি কাজে যোগদান ইত্যাদি। একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত তাকে শ্বশুরালয়ে থাকতে হয় এবং সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন তার করণীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সেই সময়কাল তিন মাস, ছয় মাস এমনকি এক বৎসরও হয়ে থাকে। কন্যার অভিভাবক সেই সময় বরের স্বভাব-চরিত্র এবং কাজকর্মের দক্ষতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বরের এইরূপ শ্বশুরালয়ে বাস করাকে 'চামারি-কাছা' বলে। ত্রিপুরার আদিবাসী রিয়াং, জমাতিয়া এবং হালাম সমাজেও এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে।"[৬২] উপন্যাসে দেখি জরকামুনিকে বিয়ের পরেরদিন থেকেই শ্বশুরবাড়ির সমস্ত কাজ করতে হয়। এই প্রথা সদ্যবিবাহিত রিয়াং যুবকদের কাছে কখনও কখনও যে বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠত, তা উপন্যাসে শাশুড়ি ও স্ত্রী সাজেরুঙের সঙ্গে জরকামুনির মনোমালিন্য বা উতপ্ত বাক্যবিনিময়ে স্পষ্ট হয়। ঔপন্যাসিক বিবাহ পরবর্তী সময়কালে শ্বশুরবাড়িতে জামাইকে কী ধরনের কাজ করতে হত, তার পরিচয় দিয়ে লিখছেন- "তিন তিনটে বছর তাকে থাকতে হবে শ্বশুর বাড়ি। তিনবার জুম

করা, তিনবার জুমের ফসল ঘরে তোলা। তিনটে শীতকাল আর তিনবার নিদান- কে জানে কত কঠিন হবে। শুধু তাই নয়, পরের বাড়ির মানুষকে আপন করে নিতে হবে। শ্বশুর শাশুড়ীকে সুখে রাখতে হবে। কোন ত্রুটি বিচ্যুতি...। জরকামুনি ভাবতে পর্যন্ত ভয় পায়। সাজেরুঙকে পাওয়ার সুখ ছাপিয়ে এই ভাবনা তাকে বিহ্বল করে তুলেছে। তার মা বাপ কী করে এই তিন বছর কাটাবে? টুকরো টুকরো স্মৃতিতে ভেসে যায় জরকামুনি।"[৬৩] ঔপন্যাসিক জরকামুনি ও সাজেরুঙের সন্তানকে কেন্দ্র করে রিয়াং সমাজের সন্তানভূমিষ্ঠ করার রীতি-পদ্ধতি, আচার ও তদ্‌জনিত বিশ্বাস এবং সংস্কারকে তুলে আনলেন। সন্তানজন্মের সময় উপস্থিত থাকেন পুরোহিত বা তলবাংহা। প্রসবকালীন মা ও অনাগত সন্তানের মঙ্গলকামনায় মোরগ বলি দিয়ে নদীর পুজো করে তলবাংহা। মন্ত্রপুত তেল মাখিয়ে দেওয়া হয় গর্ভবতী মায়ের পেটে। ধাই বা কুমায়ুক সন্তানের জন্মের পর ধারালো বাঁশের পিঠ দিয়ে নাভি থেকে ফুল কাটে। সেই ফুল সন্তানের পিতা গভীর বনের মধ্যে দুটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে ঝুলিয়ে রেখে আসে। রিয়াং সংস্কার বলে সেই ফুল রাখতে হয় এমনভাবে যে তা মাটিও ছোঁবে না, আবার বেশি উঁচুতেও থাকবে না। কারণ, তারা বিশ্বাস করে বেশি উঁচুতে নাভির ফুল রাখলে নবজাতকের জীবন ঝঞ্ঝাময় হবে আর মাটি ছুঁয়ে থাকলে পিঁপড়ে ধরলে নবজাতক ভুগবে চর্মরোগে। গর্ভাবস্থায় যে সমস্ত নিষেধ মেনে চলতে হয় মেয়েদের, তা হল-

- আদা, হলুদ চুরি করে খাওয়া। গর্ভবতী নারী গর্ভাবস্থায় আদা, হলুদ চুরি করে খেলে রিয়াংরা বিশ্বাস করে গর্ভজাত সন্তানের কোনো একটা অঙ্গের বেশি বৃদ্ধি ঘটে, ফলে প্রসবে সমস্যা হয়।
- প্রসবের সময়ের কাছাকাছি সময়ে গর্ভবতী মা তেঁতুল খেলে নাভি পেঁচিয়ে যায় ও রক্ত জল হয়ে যায়।

নবজাতকের মঙ্গলকামনায় পুজো দেওয়া হয়। কাঁচা হলুদ ও ঝাড়ুর কাঠি মায়ের খোঁপায় গুজে দেওয়া হয় অপদেবতার কুনজর এড়ানোর জন্য। রিয়াং সমাজে নামকরণ একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। অর্থব্যঞ্জক নামকরণ করা হয়। সাজেরুঙের ঠাকুমার রূপার মালা বিক্রি করে সাজেরুঙের প্রসবের খরচের টাকা জোগাড় করা হয়েছিল বলে জরকামুনি ও সাজেরুঙের ছেলের নামকরণ করা হয় "রাংথাংহা" অর্থাৎ রূপাহারা। রিয়াংদের এই নামকরণ অনুষ্ঠানের নাম "বেইবুনামা"। এই অনুষ্ঠানে "উঠোনে তলবাংহার নির্দেশ মতো এক পংতিতে পুতে বাঁশের টুকরা। পংতির পাশে বুক চিতিয়ে পাতে আর্ধেক বাঁশের ফালা। চারটা মাটির ঢেলা রাখে। চারকোণা বেতের তৈরী থালাকে বলে য়ামফ্রাক মাইরাঙ। সেই থালায় আবার কলাপাতা। উপরে এক মুঠো ভাত। থালার চারপাশে সাতটা পাতার বাটিতে সাত মুঠো ভাত ছড়ানো।"[৬৪] আদিবাসী সমাজের ধর্ম মেনে রিয়াংরাও তাদের শিকড়কে বেঁধে রাখে গানে, গল্পে। তারা বিশ্বাস করে সাতটি বনের পাহাড় দিয়ে এই সমগ্র পৃথিবী ঘেরা। মৃত্যুর বিপর্যয় হাংগারী, বাংবারি, নাকাটি, কাংসারী, সনতুই, ক্রাককুই, খেরওয়াই- এই সাতটা নদীর প্রবহমানতাকে আটকে দিতে পারে না। জীবনের মতোই নদী বহমান। নদী আর পাহাড়ের কাছে আশ্রিত রিয়াংরা ঋণ স্বীকার করে নেয় তলবাংহার মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে, প্রার্থনা জানায় আশ্রয়ের, রক্ষা করার ও শুভকামনার "হাঁটি হাঁটি পা পা চলন জানে না।/সম্মুখে আবার ঢালু পাহাড়, আঙিনা।।/ পিচ্ছিল পতনে কোলে নিও তারে।/ মুছে দিয়ো তাঁর ব্যথা সোহাগ-আদরে।।/ প্রবল উচ্ছ্বাসে ভাসাও মাটির ঢেলা।/ সোনার ফসলে ভরো সন্তানের থালা।।"[৬৫] জন্ম ও বিবাহের পর মৃত্যুকেন্দ্রিক সংস্কারকে উপন্যাসে তুলে এনে ঔপন্যাসিক রিয়াং জীবনের বৃত্তটি মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ করেছেন। পাড়ায় কেউ মারা গেলে সারাদিনরাত ধরে বিষাদের সুরে ঢোলক ও বাঁশী বাজানো রিয়াং সমাজের রীতি। রিয়াংরা মৃতদেহ পোড়ানোর পরে উঁচু মাচার ওপর ছোটো টংঘর বানায়- "সিমালুং

নক''। মৃতের অস্থি ঝোলানো থাকে এই টংঘরে। রিয়াংরা বিশ্বাস করে মৃতের আত্মা এই ঘরে বিশ্রাম করে। এই টংঘরে একটা চোঙায় সপ্তাহে একবার ভাত আর জল দেওয়া রীতি। "সিমালুং নকে"র নরম মাটির ওপর জীবজন্তু, পাখি বা মানুষের পদচিহ্ন খোঁজে প্রিয়জনেরা। আসলে তারা এই পদচিহ্নে মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্মের ইঙ্গিত খোঁজে। সাজেরুঙের গ্রামের জরকামুনির বন্ধু বিশ্বরামের "সিমালুং নকে" তার মা চিলের নখের দাগ দেখেছিল- "নির্জন দুপুরে হরিণের শিঙের মতো পাতাহীন ধুসর ডালে বসা চিল দেখে বুক তার আরও ফাটে। উড়ে উড়ে কেঁদে কেঁদে আকাশ মুখরিত চিলের ডাক। মায়ের ব্যথায় যেন খমু পাড়ার দুপুর ম্লান বিষণ্ণ। অচেনা, গভীর, অদৃশ্য দূরত্ব থেকে অচিন আহ্বান কাকে যেন ডাক দিয়ে যায় চিলের নিঃসঙ্গ গানে, দুঃখময় সুরে।"[৬৬] সাজেরুঙের গ্রামে মহামারি লাগে। জরকামুনি নতুন বাসস্থানের সন্ধানে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নিজের গ্রামে বাবা-মা মারা গেছে, ভাই চলে গেছে জঙ্গলহীন পুনর্বাসন কলোনিতে। উপন্যাসের শেষে লেখক এমন এক পরিবর্তনকে দেখালেন যেখানে দারিদ্র্য ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির পথ আছে, কিন্তু তা আদিবাসী সমাজ ও স্বধর্মের অস্তিত্বের বিনিময়ে। এই বিপন্নতার প্রতি ইঙ্গিত করেই লেখক হাসমাই রিয়াং-এর মুখে বসালেন আদিবাসী জীবনের বর্তমানের সবচেয়ে কঠিন সত্যিকে, সবচেয়ে বড়ো পরিহাসকে- "সারা জীবন জুম করে আমরা বাঁচতে পারবো না। এ অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া দিনকাল বদলে যাচ্ছে। এখন বাঁচতে গেলে নতুন কোনো বাঁচার পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে।...এই পৃথিবীর সবকিছু বদলাচ্ছে। বাপ ঠাকুরদার বাঁচার প্রথাও বদলাবে। আর প্রাচীন রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরে রাখা কিছুতেই সম্ভব না।"[৬৭] টিকে থাকতে গেলে, শোষণ-বঞ্চনা-দারিদ্র্যহীন জীবন পেতে হলে প্রান্তকে, আদিবাসীকে বাধ্য হতে হবে নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভুলে মূলস্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে।

প্রান্ত-কেন্দ্রের বিভেদ থাকবে না এভাবেই যে প্রান্তের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে একদিন গ্রাস করে ফেলতে সক্ষম হবে কেন্দ্র।

ঔপন্যাসিক সমগ্র উপন্যাসজুড়ে রিয়াং জীবনকে বিশ্বস্তভাবে তুলে আনার সময় তাদের জীবনে গান ও সুরের প্রাধান্যকে বিস্মৃত হতে দেননি পাঠককে। উপন্যাসের শুরুতে পাঠক জরকামুনিকে জুমের কাজে গিয়ে কুসুমল বাঁশি বাজাতে দেখে। গানে গানে অপরিচিত যুবক-যুবতির মধ্যে প্রাথমিক পরিচয়টুকু ঘটে- "অচেনা জুমিয়া কিশোরীকে দেখলে গান গেয়ে জিজ্ঞেস করার রীতি রিয়াং সমাজে প্রচলিত।"[৬৮] এই গান মৌখিকভাবে পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। প্রেমের প্রাথমিক অবস্থা থেকে বিরহ পর্যন্ত রিয়াংরা তাদের অনুভবকে ব্যক্ত করে গানের মধ্যে দিয়ে, আর সেই গানে একাত্ম হয়ে থাকে অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রকৃতি। কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যেও তারা গান ভোলে না, বরং খিদের জ্বালাকে ভুলিয়ে রাখে গান দিয়ে- "আসারি তানি বাইকাঙ বা মা/ থাঙ ফুরুলে নুক নাঙিয়া দো/ ফাইফলে নুক বিখাদো/ মাইপচানি বাকইয়ে খো মাইবিয়াদো। (নিদান দিনে হাওয়ায় দোলে / লাল বাইকাঙ ফুল/ যাবার পথে ক্ষুধার জ্বালা / কেউ দেখেনি তারে/ ফেরার পথে মাথায় বোঝা / কেমনে মাথায় তুলি তারে?)"[৬৯] এছাড়া, বিয়ের গান, ঘুমপাড়ানি গান, দেবতার তুষ্ট করার বন্দনা গান প্রভৃতি আরও অনেক গান রিয়াংদের জীবনকে মুড়ে রাখে। উপন্যাসের শেষে নতুন জীবনের আশ্বাস আছে। জরকামুনি ও সাজেরুঙের চোখে রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন। শিশুর আগামীর স্কুলের বাঁশির ডাকে বিভোর হয় তারা। এভাবে রিয়াং জীবনে বাঁশি জাত বদল করে। উপন্যাসের শেষে এসে লেখক সংশয়ের অবকাশ রেখে যান, অতীতের গান আগামীতে সঞ্চারিত হল কিনা, কৃত্রিম উপনগরীতে অরণ্যের মানুষ টিকে থাকতে গিয়ে নিজের আদিবাসী পরিচয়কে, স্বধর্মকে, অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলল কিনা!

অমিয়ভূষণ মজুমদারের *বিনদনি* প্রকাশিত হয় ১৩৯২ সালে শারদীয়া "সপ্তাহ" পত্রিকায় ও *মাকচক হরিণ* শারদীয়া "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকায়, ১৩৯৮ সালে। উপন্যাসদু'টি পরস্পর সম্পর্কিত। বিস্তারিতভাবে বললে *বিনদনি* উপন্যাসের দ্বিতীয় বা শেষ পর্ব হল *মাকচক হরিণ*। "মাকচক" "রাভা" শব্দ, যার অর্থ হরিণ। *মাকচক* গল্পের শেষে একটি হরিণের প্রসঙ্গে বনের মধ্যে একা হয়ে যাওয়া হরিণ বা শেষ হরিণের কথা বলা হয়েছে, যা আসলে রাভাদের অস্তিত্বের সংকটকেই ব্যঞ্জিত করেছে। *বিনদনি* ও *মাকচক হরিণ* উপন্যাসদ্বয় ও *মাকচক* গল্প – রাভা জীবন কেন্দ্রিক এই বিস্তৃত ক্যানভাস জুড়ে আছে আসলে রাভা মানুষদের শিকড়ের সন্ধান। একধরনের বিষণ্ণতা লেপে আছে উপন্যাসগুলোতে। *বিনদনি* উপন্যাসের শুরু জন চরিত্রকে অবলম্বন করে। জন কেইঝ। ইন্দো-মোঙ্গলয়েড বৈশিষ্ট্য শরীরে নিয়ে জন ধর্মে খ্রিস্টান। জন পালাচ্ছে। উপন্যাসের প্রথমের বেশ কিছুটা অংশ ধরে জনের পালিয়ে চলা ও স্মৃতিচারণা। জনের একক স্মরণক্রিয়ার পথ ধরে লেখক উপন্যাসে বিগত সময় ও ঘটনাগুলোকে নিপুণ দক্ষতায় তুলে আনলেন। জন পালানোর কঠিন বর্তমান অবস্থায় থেকেও বারবার হারিয়ে যায় অতীতে। জটিল মানসিক অবস্থায় মৃত স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে। খ্রিস্টান হয়ে যাওয়ার নীচে চাপা পড়ে যাওয়া নিজের রাভা সত্তাকে অবিরাম খুঁজতে থাকে। অস্তিত্বের এই সন্ধান জনকে নিঃসঙ্গ একলা মানুষ বা একলা রাভা করে তোলে।

রাভা সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সন্তান তার মায়ের গোত্র পেত। চাষের জমির উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করত রাভা কন্যারা। পুরুষ তার দেখাশোনা করত। এই সমাজ ক্রমেই পিতৃতান্ত্রিকতার দিকে ঝোঁকে, তখন থেকেই নিজেদের সংস্কৃতি বিস্মৃত রাভারা হিন্দু, মুসলিম বা খ্রিস্টান হতে শুরু করে। তবু সত্তার গভীরে কোথাও শিকড়ের টান থেকে গেছে বলেই "চিকাবাইরাই"-কে অস্বীকার করতে পারে না। রাভারা বারবার আশ্রয় খোঁজে নারীর কাছে, কারণ সেইই জানে তার আত্মার উৎস। মৃত্যুকালে এই

উৎসের সন্ধান না পেলে আত্মা ফিরতে পারবে না তার পূর্বের জায়গায়। জীবন-মৃত্যুর বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে না। ইতিহাস বলে, রাভাদের দলে দলে হিন্দু হয়ে যাওয়া তাদের সামাজিক আন্দোলনের ফসল।এই আন্দোলন দু'টো ভাগে ঘটে। সূত্রপাত ১৯৩০ সালে। "The background of the movement of 1930 was the exclusion of the Rabha people from the Bharoa village of Tufangunj subdivision of Cooch Behar. Religious gatherings were organized in Harisabha by the non-Rabha Hindus. The Rabhas were not allowed to enter into the Harisbha."[৭০] মিশ্র সমাজে বসবাসকারী বঞ্চিত ও অপমানিত রাভাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় ভবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী নামক এক সন্ন্যাসী রাভাদের হিন্দু সংস্কার পালনে ও হরিসভায় যোগদানের পক্ষে মত দেন। রাভাদের স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে তাদের উৎস সম্পর্কে উপন্যাসে পাওয়া যায়, রাভারা বিশ্বাস করে গারোরা ধান বুনতে পারত না বলে "ফির ধান চাষের জন্য পেলেন থাকি যে কোচগুলাক পাহাড়ে ডাকি নিছে, তারায় রাভা। ডাক দেয়া থাকি রাভা"[৭১] যদিও উপন্যাসে আমেরিকা থেকে আগত গবেষক জেন এ যুক্তি মানেননি। কারণ যে "রব" থেকে রাভা শব্দের উৎপত্তি বলে এই মিথে দাবি করা হচ্ছে, সেটা সংস্কৃত শব্দ। কোনো একসময় পাহাড় থেকে বিতাড়িত হয়ে বা অন্য কোনো কারণে রাভারা সমতলে আসে। এই রাভারা রাজবংশিদের 'ক্ষত্রিয়ায়ণ' দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং হিন্দু সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে রাজবংশিদের মতো সামাজিক মর্যাদা ও স্থান পেতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। হিন্দু সমাজভুক্ত হওয়ার জন্য তারা আন্দোলন করে। মানবেন্দ্র ঠাকুরের সহায়তায় ১৯৩৪ সালে ভবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী রাভাদের হিন্দুত্বকরণ করার ব্যবস্থা করেন শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে। বলা হল, শুয়োর ও মুরগি পালন করা যাবে না, চকোৎ খাওয়া যাবে না। শুদ্ধিকরণের মধ্যে দিয়ে রাভারা হিন্দু শূদ্রে পরিণত হল এবং তাদের নামের শেষে "দাস" পদবি যুক্ত

হল। যদিও সেই সময় এই আন্দোলন খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি। এর কারণ অবশ্য এটাও যে, রাভাদের সামাজিক অবস্থানের বদলের ফলে অসন্তুষ্ট রাজবংশিরা রাভাদের ওপর চাপ তৈরি করেছিল তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ফিরে যেতে। অন্যদিকে, হিন্দু হয়ে যাওয়া রাভাদের নিজেদের সমাজে আর ফিরিয়ে নিতে চাইছিল না অরূপান্তরিত রাভারা। ফলে সমাজে আবার অসন্তোষ তৈরি হয়। এই অবস্থায় ১৯৩৯-৪০ সাল নাগাদ রাভাদের হিন্দুত্বকরণ প্রক্রিয়া পুনর্জীবিত হয়। কারণ, এই ভয়ও ছিল এই রাভাদের হিন্দু সমাজে ঠাঁই না দিলে তারা মুসলিম বা খ্রিস্টান হয়ে যেতে পারে। উপন্যাসে রাভাদের মুসলিম বা খ্রিস্টান হয়ে যাবার নিদর্শন আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাভাদের হিন্দুত্বকরণ প্রক্রিয়াটি চলে মূলত ধনেশ্বর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে। এই সময় ধনেশ্বর ভট্টাচার্য কোচবিহার রাজপরিবারের পণ্ডিত মদনকুমার স্মৃতিরত্নের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে যজ্ঞ ও শুদ্ধিকরণের মধ্যে দিয়ে রাভাদের হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা হয়। হিন্দু আচার-পালন, হরিনাম গান ও চকোৎ বা যে কোনো ধরনের মাদক বর্জনের মধ্যে দিয়ে এই প্রক্রিয়া চলেছিল। বিশেষত লোকালয়ে বসবাসকারী রাভাদের মধ্যেই এই আন্দোলন চলে, বনবাসী রাভাদের মধ্যে নয়। বনবাসী রাভাদের মধ্যে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা আরও পরে, ১৯৫৮-৬০ নাগাদ।

বুদিনাথ দাস হিন্দু হয়ে যাওয়া রাভা। বিনদনিও। বিনদনির পিতা হরিমন্দিরে খোল বাজাতেন, নবদ্বীপে তীর্থ করতে গিয়ে তিনি সেখানকার বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যান। জনাথন অথবা জনাদন অথবা জনাদ্দন খ্রিস্টান। অথচ সত্তার গভীরতম প্রদেশ থেকে তারা রাভাসত্তাকে উপড়ে ফেলতে পারে না বলেই পরিচয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়। হিন্দু হওয়ার প্রাথমিক শর্ত ছিল মাদক পানীয় (চকোৎ) ও শুয়োর বা মুরগি প্রতিপালন ত্যাগ। অথচ হিন্দু হয়ে যাওয়া বুদিনাথ নিজের রাভা

পরিচয়টা প্রতিষ্ঠা করতে চায় এর মধ্যে দিয়েই, সে বলে– "আমাদের রাইন্তুক পূজা করিতে পর্ক মাংস আর চকোৎ-মদ লাগে। হিন্দুদের নাই লাগে।"[৭২]

বিনদনিরাও চকোৎ খাওয়া ছাড়তে পারেনি। বিনদনির পিতা চকোৎ খেয়েই কৃষ্ণনামে মজতেন। আবার, কৃষ্ণনাম করলেও বাড়িতে পূজিতা হতেন রাইন্তুক। রাইন্তুক বা রুন্তুক বা রান্তুক রাভাদের প্রধান দেবতা। প্রতি রাভা ঘরে এই দেবীর স্থান দেবী "বাশেক"-এর সঙ্গে। রাইন্তুক ও বাশেক পূজার সঙ্গে ধান জড়িয়ে। রাইন্তুক পুজোতে ধানের গোলার বেদিতে চাল ভর্তি হাঁড়ি রাখা হয় এবং সেই হাঁড়ির চালের ওপর রাখা হয় সিঁদুর মাখানো হাঁসের ডিম। রাইন্তুকের পূজায় বাঁশের পাত্রে চকোৎ দেওয়া হয়। রাভাদের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী রাভাদের প্রধান দেবতা "ঋষি" বা "মহাকাল"। তিনি স্বর্গে বাস করেন এবং তাঁর নির্দেশেই পৃথিবী পরিচালিত হয়। তিনি সন্তুষ্ট থাকলে রাভাদের মঙ্গল হয়। রাভা সমাজে "হাইসুক" বা হৌসুক বা গোত্র মাতৃতান্ত্রিক। সন্তানেরা মায়ের গোত্র পায়। রাভা বিবাহে মায়ের গোত্র দেখা হয় এবং পাত্র-পাত্রী উভয়ের মায়ের গোত্র হলে বিবাহ হয় না। পিতার গোত্র রাভা সমাজে বিশেষ মান্যতা পায় না। হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি মায়ের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পায় কন্যারা। তাই রাভাজমির মালিক হয় রাভা কন্যারা। মায়ের থেকে পাওয়া সূত্রে পাওয়া ধানের জমি যেন মায়েরই শরীর। *সোঁদাল* উপন্যাসে অমিয়ভূষণ লিখছেন– "... ধানজমি আর রাভাকন্যা আর রাভাগৃহ, এক থেকে অন্যটা পৃথক হয় না। জমি আর কন্যা একই আত্মার দুই পৃথক রূপ, কন্যার গৃহও তাই। পুরুষ লাঙ্গলের ফলা হতে পারে; তারপর তো সে এদিক ওদিক চলে যাবে, কন্যা ছাড়া কে লালন করবে ধান! কিন্তু সেই ঘর যদি রাভাকন্যার শরীরও না হয়, কোথায় আশ্রয় পাবে পুরুষ! সেজন্যই ধানের জমি আর ধান, গৃহ আর সন্তান সব সময়েই রাভাকন্যার, রাভা পুরুষের নয়। পুত্রই হোক অথবা কন্যা, মায়ের পরিচয়েই পরিচয়, মায়ের গোত্রই গোত্র। জমি ধ্রুব, গৃহ ধ্রুব, জননী ধ্রুব। এই

ধ্রুবতার আশ্বাস ছাড়া ধান আর সন্তান ভালো হয়?"[৭৩] অথচ দ্রুত এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিকতায় ঝোঁকে। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে জমি পুরুষের। মায়ের থেকে পুত্র সন্তানের, পিতার থেকে পুত্র সন্তানের। আর হয়তো তাই রাভারা হিন্দু হতে চেয়ে আন্দোলন করেছিল। যে রাভারা হিন্দু বা মুসলিম হয়ে গেছে সেইসব পুরুষ সন্তানেরা জমির অধিকার ভোগ করে, অথচ পুরোপুরি রাভা সত্তাকে বিসর্জন দিতে পারে না বলেই নিজেদের মায়ের গোত্রে পরিচয় দেয়, রাইন্তক পুজো করে, সেই পুজোয় শুয়োর বলি দিতে পারুক না পারুক চকোৎ (চাল থেকে প্রস্তুত মদ) দেয়, নিজেরা চকোৎ পান করে, চল্লিশ বছরের বেশি হিন্দু হয়ে যাওয়া, হিন্দু আচার ও মন্ত্র নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা শ্যামচাঁদের ঠাকুরদাকেও মৃত্যুর সময় তাঁর চিকাবাইরাই শুনতে হয়েছিল- "লসৎ হা লসৎ হা", অর্থাৎ উজ্জ্বল পাহাড়। হিন্দু হয়ে যাওয়া শ্যামচাঁদের ঠাকুরদার রাভা আত্মা সেই পাহাড় থেকে এসেছিল, আবার সেখানেই ফিরে যাবে। মায়ের গোত্রের পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় না বলে বমভোলা ওরফে বিষাদু মিঞার হিন্দু হয়ে যাওয়া বাবা যদু দাস (হিন্দু হয়ে যাওয়ার পরেও তারা রাভা রীতি অনুযায়ী মায়ের গোত্রে পরিচিত হয় বলে) বিবাহের নিমিত্তে একদিন মুসলিম হয়ে যায়। এভাবেই রাভা সমাজ ক্রমেই পরিবর্তিত হতে হতে নিজস্বতা হারাতে থাকে, হারায়।

বিনদনি উপন্যাসের পটভূমি তল্লিগুড়ি গ্রাম, মরা রায়ডাকের পাড় ঘেঁষে। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র জন স্ত্রী বিন্দের মৃত্যুর পর গোলাপগঞ্জের ব্যাপটিস্ট মিশন হাউসে গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়। সেই জন পালাচ্ছে, সেই মিশন থেকে পালাচ্ছে, খ্রিস্টান থেকে রাভায় পালাচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে বিন্দের গ্রামে, যেখানে সে বিয়ের পরে ছিল, যেখানে শাশুড়ি, বিন্দের মা বিনদনি থাকে। আমেরিকা থেকে গবেষণা করতে আসা জেন বেরলিঙ্গার কাছে পিতলের মতো হলুদ লম্বা একহারা শরীর, চওড়া নাক ও কপাল ঢাকা কালো চুল নিয়ে জন আসলে রাভাই, "দ্য ফাইনেস্ট স্পেসিমেন।"[৭৪] জেন ম্যাম এবং

জোন ম্যামের কাছ থেকেই জন জেনেছে, বুঝেছে ভাষা মরে গেলে জাতি মরে যায়, সংস্কৃতি হারিয়ে যায়। তাই সে নিজেকে, নিজেদের জানতে চায়। জেনের বইয়ের র‍্যাক থেকে রাভা-কোচেদের ওপর লেখা বই পড়ে। সে রাভাসত্তা খুঁজেছে নিজের মধ্যে, আশেপাশে মানুষগুলোর মধ্যে। সে রাভা শব্দ খুঁজেছে। বিনদনি বা বিন্দে কোনওটাই রাভা শব্দ নয়, বিনদনি বাংলা বিনোদিনীর উচ্চারণভ্রংশ - এও সে জেনেছে জোন ম্যাডামের কাছ থেকে। সে জানে 'রীয়া' মানে "নেই"। "মায়রীয়া" মানে যার মা নেই, "হাওরীয়া" মানে যার জমি নেই। ভাষা আগ্রাসনের শিকার রাভাভাষা। দুদিয়ার মুখ দিয়ে ঔপন্যাসিক এই ভাষা আগ্রাসনের স্বরূপটাই প্রকাশ করলেন- "ভাষা হয় আজার। আজ্যের হয় ভাষা।"[৭৫] শাসকের ভাষা, কেন্দ্রের ভাষা এইসব অন্যান্য ভাষাকে প্রান্তিক করে তোলে। ভাষার সাম্রাজ্যবাদ চলতে থাকে। রাজবংশি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার দাপটে হারিয়ে যায় রাভাভাষা।

উপন্যাস অবলম্বনে রাভা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিগত অস্তিত্ব সংকটের স্বরূপ স্পষ্ট হবে মূলত তিনটে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে- প্রথম ঘটনা, জন গোলাপগঞ্জ ব্যাপটিস্ট মিশনে খ্রিস্টান হয়। আমেরিকা থেকে আগত রাভা গবেষক জেন বেরলিঙ্গার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। জেন ও জোনের কাজে সাহায্য করে জন। জেনের কাছ থেকে নিয়ে রাভা বিষয়ক বই পড়ে নিজের সম্প্রদায়ের কথা জানতে আগ্রহী হয় জন। তাই ম্যাডামের ঘরে তার অবাধ যাতায়াত। এমনি একদিন জেনের হীরে বসানো ঘড়ি হারায়, সন্দেহের শিকার হয় জনাদন। কুৎসিত দেহতল্লাশি এবং উলঙ্গ কথা ও মানসিকতার শিকার হয় সে। মিশনের সাহেব বলে "...টাইবাল তো, যেদুবা খৃস্টান, চামড়াৎ দেখো লুকানো পকেট থাকে।"[৭৬] দ্বিতীয় ঘটনা, বুদিনাথ দাস হিন্দু। আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাভা থেকে হিন্দু হয়ে গেছিল বুদিনাথের কোনো পূর্বপুরুষ ধানজমিতে পুরুষের অধিকার কায়েম করতে অথবা সামাজিক মর্যাদা রাজবংশিদের সমান পেতে। হিন্দু বৈষ্ণব হয়েও বুদিনাথ জানে- "আর হিন্দুরা হামার হাতৎ না-

খাইবে। আর হামরা না শিড়ুল টাইব।"[৭৭] পূর্ববাংলা থেকে আগত বাঙালিদের মধ্যেও রাভাদের সঙ্গে থেকে, রাভাদের জমি চাষ করেও তাদের প্রতি শুধুমাত্র আদিবাসী হওয়ার জন্য তীব্র ঘৃণা লক্ষ করেছে জন। রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া "উপজাতি" তত্ত্বকে খারিজ করে প্রশ্ন তোলে জন– "হামরা না টাইবাল। দেশ যেদু আমার, তো মুই কেনে টাইবাল থাকি যাই? আর উম্রা হয় জাতি বডার থাকি আসিয়াও।"[৭৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে রাভারা "তপশিলি উপজাতি" হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়, তার আগে কোচেদের মতো তারাও "তপশিলি জাতি" হিসেবে গণ্য হত। "Since 1959 the Rabhas of the State of West Bengal are recognized as the Scheduled Tribe."[৭৯] তৃতীয় ঘটনা, বমভোলা ওরফে বিষুদ ছোটোবেলায় বিষহরি সেজেছে। তারপর বাঙালি মুসলিমদের সংস্পর্শে আসার পর জেনেছে মুসলমান হয়ে হিন্দু দেবতা সাজা যায় না। কিন্তু "বমভোলা" নামটুকু রয়ে গেছে। সে জানে ভিতরে ভিতরে সে রাভা রয়ে গেছে। নিষ্ঠাবান মুসলিম হতে পারেনি। তাই স্ত্রী লজুকে বলেছে, "মুই হয়তো ভালো মুসলমান না হং। মুইও খানেক হৌলদিয়া মানুষ!"[৮০] তিনটে মানুষের জীবনের তিনটে পৃথক কাহিনি আসলে এক সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়, কোথাও তাদের রাভাসত্তা ভুলতে দেওয়া হয় না, কোথাও তারা নিজেদের রাভাসত্তাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে না, অথচ পুরো রাভাও হয়ে উঠতে পারে না। বহু যুগ হেঁটে এসেছে বলে শিকড়ের কাছে ফিরতে পারে না। আদিবাসী চামড়ায় লেপে দেওয়া চোর অপবাদের অপমান নিয়ে জন ফেরে শাশুড়ি বিনদনির কাছে। নারীর কাছে। ফিরতে ফিরতে পথে অবচেতনে কথা বলেছে মৃতা স্ত্রীর সঙ্গে। তেরো বছরের স্কুলের নীল ফ্রক পরা, মেখলা পরা বিন্দেকে মনে পড়ছিল তার। হয়তো বুকের ভেতরে জমে থাকা মিশনকৃত অপমানের কথা মৃতা স্ত্রীর কাছে বলে কষ্ট লাঘব করতে চেয়েছিল। আর সেই সঙ্গে ডুবে যাচ্ছিল অনুতাপে, কিশোরী স্ত্রীকে সন্তানভার দেওয়ার অপরাধে, যে কারণে মৃত্যু হয় বিন্দের। বিন্দের প্রতি

ভালোবাসায় ডুবে জনের মনে হয় বিন্দের আত্মা নিশ্চিত কোনো উজ্জ্বল ঝর্না (ললৎ চিকা) থেকে এসেছিল। খ্রিস্টান জন থেকে রাভা জনে ফিরতে চাওয়া ও না পারার দুঃখ এভাবে প্রকাশ করে সে– "শেষবারের মত দুঃখে হেসে বলল, তুই ধানজমি না পাতিস, তো মুই কেন্ ফিন রাভা হং, বিন্দে?"[৮১] যুগে যুগে রাভা পুরুষেরা জীবন ও মৃত্যুতে রাভা নারীর কাছেই আশ্রয় চেয়েছিল, আশ্রয় পেয়েছিল। রাভা সমাজ বদলে যাওয়ার আগে সেখানে "কিলাংনানি" বা "জামাতা বিবাহ" প্রথা ছিল বলে ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন। স্বামী ও কন্যা মারা গেলে শাশুড়ি জামাইকে বিয়ে করতে পারত চাষের জমির রক্ষার্থে। শেষপর্যন্ত জনাদন বিনদনির কাছে সমর্পণের মধ্যে দিয়ে তার রাভাসত্তা খুঁজেছে। বিনদনির অস্বস্তিতে তাকে অন্তত "মা" হয়ে তার সঙ্গে বনে যাবার অনুরোধ করেছে। পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার আগে বিপদকে তুচ্ছ করে যে বিনদনিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছিল, তাও ছিল তার রাভাসত্তার পথে ফেরার তাগিদ, সেই পথেই এগিয়ে যাওয়া।

যদি যাওয়া সম্ভবও হত, কোথায় নিয়ে যেত জন বিনদনিকে? বন কোথায়? রাভা পুরুষদের জমি কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু রাভা-নারীর ধান-জমি তারা দেখত। ধান-জমির না থাকলে রাভা পুরুষদের আশ্রয় হত বন। *সোঁদাল* উপন্যাসে অমিয়ভূষণ লিখছেন- "মলগুঁ যেন বলতে চাইছে, বন কোথায়? অরণ্য কোথায় গেল? রাভা পুরুষদের সে ক্ষেত্রে কী কাজ অবশিষ্ট আছে আর? রাভা মেয়েদের ধানজমিতে চাষ দেওয়ার পরে কোনো কাজই কি এখন আর অবশিষ্ট থাকে রাভাদের, যদি সে বনে বনে শিকার না করে?...যে তোমাকে ধানখেতে সাহায্য করতে ডেকেছিল, সেই নেই। তখন বনই তো তোমাদের আশ্রয়, কারণ ধানখেতে, সেই গৃহে তোমার কিছুমাত্র স্বত্ব নেই তখন।"[৮২] আর তাই তো জনের মায়ের মৃত্যুর পর জনের বাবা বনে চলে গিয়েছিল। কিন্তু অবস্থা পাল্টেছে। পূর্ব-পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত উদ্বাস্তু বাঙালিদের জন্য ব্যবস্থা করতে কাটা হয় জঙ্গল।

বর্গাদারি আইনের বলে রাভা জমিতে ধীরে ধীরে অধিকার জন্মে যায় ধানচাষে পারদর্শী এই উদ্বাস্তু বাঙালিদের, বাঙালি হিন্দুদের। ‘‘The West Bengal Land Reforms Act of 1955’’ আইনে বলা হয়েছে জমিতে যারা অর্ধেক ফসলের অধিকারের বিনিময়ে শ্রম দেয় তারা হয় ‘‘আধিয়ার’’- “This act (Chapter –II, Section -16-1 A and B) states that the produce of any land cultivated by a *bargadar* or *adhiar* shall be divided between the *bargadar* and the person whose land he cultivates: (a) in the proportion of 50:50 in a case where plough, cattle, manure and seeds necessary for cultivation, are supplied by the person owning the land, (b) in the proportion of 60:40 in all other cases.”[৮৩] এই বর্গাদারি আইন ভূমিহীন মানুষদের ভূমি দিয়েছিল বটে, কিন্তু রাভাদের ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছিল তা হল, রাভা জমির ওপর ক্রমেই অ-রাভাদের অধিকার কায়েম হল। বন নেই, জমিও চলে যাচ্ছে – রাভাদের জীবিকার বৃত্ত ছোটো হতে থাকে। এছাড়াও রাভা জমি ছিল রাভা-কন্যার। জমির সঙ্গে তাদের মায়ের যোগ, নাড়ির যোগ; সেই জমিতে চলে যেতে লাগল হিন্দু পুরুষদের কাছে। রাভাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ওপর এই আঘাতে সমাজ বিপন্ন হল। ফলে বর্গাদারি আইন ও পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুরা রাষ্ট্রের দূরদর্শিতার অভাবে রাভাদের সাংস্কৃতিক বিপদ ডেকে এনেছিল। আধিয়ার বোজোকে চাষ করতে দেওয়া শাশুড়ি বিনদনির জমির অধিকার বজায় রাখতে মরিয়া জনাদন জেন ম্যাডামের কাছ থেকে চুরি করে আনা (অবশ্য ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সে চিরকুটে লিখে এসেছিল) রাইফেলের বুলেট দিয়ে হত্যা করতে চায় বোজোকে। সেই অপরাধে পুলিশের গুলিতে মারা যায় জন। রাভা জনাদন। রাভা নারী আর সেই নারীর দেহের মতো জমিকে

রক্ষা করতে চেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছিল, বনে চলে যেতে চেয়েছিল বিনদনিকে নিয়ে, কারণ রাভা পুরুষের মতোই সেও বিশ্বাস করত "আমার আত্মার পথ আর কেউ জানে না"[৮৪]

জনের খ্রিস্টান হয়ে যাওয়ার আগে বিন্দের সঙ্গে বিয়ের প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে রাভা বিবাহের যে স্বল্প পরিচয় লেখক তুলে ধরেছেন তাতে জানা যাচ্ছে, রাভাদের সব অনুষ্ঠানেই চকোৎ লাগে। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য লাগে শুয়োর বা মুরগির মাংস। তবে বিয়ের আগে রাইন্তুক ও তুলসি মঞ্চে বলরাম পূজা করা হয়। এই বলরাম পূজা থেকে বোঝা যায় রাভাদের আচার ও রীতিনীতি হিন্দু আচার দ্বারা প্রভাবিত। মৃত্যুর পর রাভা শবদেহের শ্মশান পর্যন্ত শেষযাত্রা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। কোচ রাজাদের সৈন্যদের দেওয়া সেই অস্ত্রে সজ্জিত যাত্রা যেন যুদ্ধযাত্রা। *বিনদনি* ও *মাকচক হরিণ* উপন্যাসদ্বয় আসলে এক লড়াইয়ের কথা বলে। রাভা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জনাদনের লড়াই। প্রায় হারিয়ে যাওয়া শিকড়ের সন্ধান, মূলস্রোতের সংস্কৃতিতে মিশে যাওয়ার যে সংকট প্রায় সব আদিবাসী সংস্কৃতির বর্তমান বিপদ, জন তার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে একা লড়াই করেছে।

মহাশ্বেতা দেবীর *জঙ্গল* উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে, "ঋতুপত্র গাঙ্গেয়" পত্রিকায়। উপন্যাসটি খেড়িয়া শবরদের অবস্থা ও নৃশংস ডাইনি প্রথার কথা তুলে আনলেও এটি মূলত দু'টি নরনারীর স্বাভাবিক যৌন ক্ষুধার আখ্যান। মহাশ্বেতা দেবী ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের কথোপকথনে মহাশ্বেতা দেবী একস্থানে স্বীকার করে নিয়েছেন "পুরুলিয়ার খেড়িয়াশবরদের জন্য কাজ করা আমার জীবনের শেষ উদ্দেশ্য। এখন ওরা আমার জীবনের অংশ। আমি ওদের জন্য বেঁচে আছি।"[৮৫] উপন্যাসের শুরু একটা অর্জুন গাছের গরাম দেবতা হয়ে ওঠা দিয়ে। "গরাম দেবতা" অর্থাৎ গ্রাম দেবতা। গাছের হঠাৎ করে গরাম দেবতা হয়ে ওঠা কাহিনির নেপথ্যে ঔপন্যাসিক লিপিবদ্ধ করে দেন

খেড়িয়া শবরদের ওপর চলা শোষণ ও ঘৃণ্য রাজনীতির। এই অংশটির অনুরূপ কাহিনি তাঁরই *অর্জুন* গল্পটি। উপন্যাসে অর্জুন গাছ থেকে চার মাইল প্রাচীন জঙ্গল কেটে ফেলার প্রাথমিক ধাপ ছিল অর্জুন গাছটি কেটে ফেলা, বাকি সব বিষয়ে তেরঙা দলের পালধি ও লাল দলের মাহাতোর বিবাদ থাকলেও এতে দুয়েরই লাভ, দুইয়েই আর্থিক স্বার্থ জড়িত। গাছ কাটবে খেড়িয়ারা, কেটে জেলে যাবে- "এমনি করেই সব চলছিল। পালধি ও মাহাতো জানত গাছ কাটা হবে। কাটবে খেড়িয়া শবরেরা। চিরকাল ওরাই কাটে। কাটবার কারণে ওরাই জেলে যায়।"[৮৬] *অর্জুন* গল্পেও দেখি পার্টির নেতাদের জন্য সরকারি বন কাটার শাস্তিতে জেলে যায় কেতুরা- "পুরুলিয়াতে শবর ঘরে জন্মালে জঙ্গলে হাত দিতেই হবে, জেলেও যেতে হবে, এ একেবারে নিয়ম।"[৮৭] অথচ এই শবররা ছিল অরণ্যের সন্তান। জঙ্গল ছিল মায়ের মতো আশ্রয়দাত্রী। অরণ্যের ওপর নির্ভর করে, তার ফলমূল, মধু, কাঠ দিয়েই চলত তাদের জীবন। জঙ্গল যত কমেছে, তত আশ্রয়হীন হয়েছে, উদ্বাস্তু হয়েছে তারা, তারপর অন্য কোথাও অন্য কোনো অরণ্যের খোঁজে সরে গেছে। এই গল্পে কেতু অতীতচারণা করে, "যখন জঙ্গলের মতো জঙ্গল ছিল, যখন শবররা ছিল বনজীবী। বাইরের মানুষ দেখলে যখন ওরা ত্রাসিত খরগোশ বা খেড়িয়ার মতো বনের পেটে ঢুকে যেত, সে সব দিনের কথা। সেইজন্যই কি ওদের নাম খেড়িয়া শবর?"[৮৮] এই গল্পে লোভীদের নজরে পড়া অর্জুন গাছটা কাটতে হয় না কেতুকে। দিগা শবরের স্বপ্নের চাতুরি হারিয়ে দেয় রাম হালদার ও বিশাল মাহাতোকে। গ্রামদেবতা হয়ে সত্যিই যেন শবরদের লুণ্ঠিত জঙ্গলকে রক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে গাছটি। অনুরূপ ঘটনা ঘটে উপন্যাসেও। মাহাতো ও পালধির আর্থিক লালসার হাত থেকে গাছটাকে ও গাছ কেটে জেলে যাওয়ার হাত থেকে কোনো এক খেড়িয়াকে বাঁচাতে মোহনই গুজব তুলে গাছটিকে গরাম করে দেয়।

উপন্যাসে সনাতনের মেয়ে ছাতিমবালা তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে করতে বাধ্য হয় দশরথ মুদির বামন ছেলে মকর মুদিকে। ওষুধি লতা-পাতার জ্ঞান আছে তার, সেই জ্ঞান সে পেয়েছে সাঁওতাল গুরু পর্বত মাঝির কাছে এবং এই জ্ঞান নিয়েই নিজের সমাজে তার প্রতিপত্তি। কিন্তু ছাতিমবালা এক রক্ত-মাংসের মানবী, যার দৈহিক চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা এই গুণে নিবৃত্ত হয় না। "ছাতিমবালার মনে হয়, দেহের সুখ? ঝালা নদীর জলে নিমতেলে মেজে, ধুঁধুল খোসায় ঘষে স্নান করার সময়ে কতদিন সে জলে দেখেছে তার উদ্ধত স্তন, কালো শাঁখের মতো ত্রিবলী গলা, জলকলমির মতো ঝাঁপালো চুল। এমন দেহ কি নাটা মকর ভোগ করবে?"[৮৯] ফলে, এই বিয়ে ছাতিমবালার জীবনে সুখ নিয়ে আসে না। তাই, মোহনের সতেজ বন্য দেহে ছাতিম তার এতদিনের দৈহিক তেষ্টা মেটায়। মকরকে ত্যাগ করে মোহনের সঙ্গে ঘর বাঁধে সে, পরস্পর পরস্পরের ভালোবাসায় বুঁদ হয়ে থাকে। অন্যদিকে, মকর ছাতিমের দুঃখে বাড়ি ত্যাগ করে এবং দেড়বছরের মাথায় দৈবীকৃপা নিয়ে ঠাকুর হয়ে ফেরে। তার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে। ঠাকুরালির মাহাত্ম্যের নীচে, ধর্মীয় ভাবাবেগে চাপা পড়ে বাস্তবতা, মকরের দেওয়া ওষুধে নটবর মুর্মুর চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, লবান পাত্রের ছেলের জ্বরে ওষুধ কাজ করে না, অবন মাহাতোর যমজ ছেলে মরে। চালাকির দ্বারা এই ব্যর্থতাগুলোকে সে ডাইনির ষড়যন্ত্র হিসেবে চালিয়ে দেয়। প্রবল জনপ্রিয়তা, আধিপত্যও মকরকে ছাতিমের প্রত্যাখ্যানকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। ফলে, গুরু পর্বতের অকাল বিধবা কন্যা সুখমণির ওপর থেকে ডাইনির অপবাদ অনায়াসে সে চালান করে দেয় ছাতিমবালার ওপর। ধরে আনা হয় ছাতিমবালাকে, ছাতিমবালার মান্যতা পেতে চায় সে। কিন্তু পারে না। মোহন এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ছাতিমবালাকে, উন্মাদ হয়ে যায় মকর। উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী সমাজে ডান-ডাইনি চিহ্নিতকরণের পেছনে যে ঘৃণ্য রাজনীতি চলে তাকে স্পষ্ট করেছেন। উপন্যাসে দেখি সাঁওতাল সমাজে ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই চালায় চন্দ্রচূড় হাঁসদা। এই

লড়াইতে একসময়ে মারা গেছে সঙ্গী জলেশ্বর মুর্মু, সদা টুডু। এই জলেশ্বর ছিল চন্দ্রচূড়ের কাকা পর্বত মাঝি মেয়ে সুখমণির স্বামী। ডান-বিরোধী লড়াইতে স্ত্রীকেও টেনেছিল জলেশ্বর। সুখমণি চোখের সামনে জলেশ্বরকে গলায় কোপ মেরে হত্যা করে যারা, তাদের মধ্যে মথুরাও ছিল। সুখমণি ভুলতে পারে না সেই ঘটনা, ভোলে না হত্যাকারীদেরও। তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে চলে আসে, কিন্তু সেই দৃষ্টিকে ভয় পায় মথুরার অপরাধী মন। তাই সুখমণিকে ডাইনি সাব্যস্ত করে নিস্তার পেতে চায় সে- "জলেশ্বরের রক্তাক্ত কবন্ধ মথুরা আজও ভোলেনি। সুখমণির চোখ দেখে অপরাধবোধ ওকে হিংস্র করে। ওই বলে, ডাইন হয়ে গেছে গো। সবাই এসো। সোর উঠে যায়।"[৯০] সুখমণিকে ডাইনি অপবাদ থেকে বাঁচায় মকর, কিন্তু ছাতিমকে পেতে সেই ডাইনি অপবাদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতে মকর ছাতিমবালার জন্য। এইভাবে ঔপন্যাসিক দেখালেন কীভাবে ডাইনি নির্ধারণের পেছনে স্বার্থসিদ্ধির লালসা কাজ করে। ছাতিমবালার ওপর এই অপবাদের প্রতিবাদ করে চন্দ্রচূড়। কিন্তু কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য শিকড় সমাজ থেকে উপড়ে ফেলা সহজ নয় বলেই সে উপলব্ধি করে- "অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, চন্দ্রচূড় বোঝে যে বাধা দিলে সে ভেসে যাবে।"[৯১] মহাশ্বেতা দেবী এই চন্দ্রচূড় চরিত্র প্রসঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন যে বাস্তবের ডাইনি বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা সারদাপ্রসাদ কিস্কুর ছায়া পড়েছে এই চরিত্রে- "চন্দ্রচূড় হাঁসদায় সারদাপ্রসাদ কিস্কুর ছায়ার একটুখানি পড়তেই পারে। তবে সারদাপ্রসাদ সর্ব অর্থেই ছিলেন একজন মহীরুহ বনস্পতি।"[৯২] ১৯৮৪ সাল থেকে পুরুলিয়ায় সারদাপ্রসাদ কিস্কুর নেতৃত্বে ডাইনি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। সারদাপ্রসাদ কিস্কুর প্রসঙ্গ আসে ভগীরথ মিশ্রের *জানগুরু* উপন্যাসেও। সেখানে মনসারাম শিকার, সুফল মুর্মু, সাহেব হেমব্রমদের "তালডাংরা কুসংস্কার লিবারণ সমিতি"র বার্ষিক সম্মেলনে ডাইন-বিরোধী আন্দোলনের মূল হোতা ও পুরুলিয়ার কবি সারদাপ্রসাদ কিস্কু ও মহাশ্বেতা দেবীকে আনার মনসারামের ইচ্ছের কথা শুনিয়েছেন

লেখক। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। "জানগুরু" হচ্ছে যারা ডাইনি চিহ্নিত করে এবং বিচার করে। সাঁওতাল লোককথা অনুসরণে গুরুচরণ মুর্মু লিখলেন- "সান্তাড়ের লোককথায় আছে যে মারাং বুরু শ্রেষ্ঠ 'শক্ত' (স্ত্রীলিঙ্গে শক্তি)। একবার স্ত্রী জাতির অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে সান্তাড় পুরুষগণ মারাং বুরুর দ্বারস্থ হন। তিনি তাদের বিশেষ একটা দিনে তাদের আসতে বলেন। স্ত্রীগণ যেভাবে হোক পুরুষদের উদ্দেশ্য বুঝে তাদের অনুসরণ করে। ফলে মারাং বুরু যে পুরুষদের ত্রাণের উপায় নির্দেশ করবেন তাও স্ত্রীগণ জেনে ফেলে। ফলে নির্দিষ্ট দিনে স্ত্রীগণ পুরুষদের পরম যত্নে পান-আহার করায় এবং তাতে পানের মাত্রা বেশি থাকায় পুরুষগণ পানমত্ত হয়ে মারাং বুরুর কাছে যাওয়ার কথা ভুলেই যায়। স্ত্রীগণ ছাগলের দাড়ি কেটে নিজেদের 'গোঁফ' লাগিয়ে মারাং বুরুর কাছে উপস্থিত হয়। মারাং বুরুও পুরুষ মনে করে ত্রাণ মন্ত্র শিক্ষা দেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে পুরুষেরা চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। তখন তাদের মনে পড়ে যে মারাং বুরুর কাছে নির্দিষ্ট রাতে যেতে পারেনি। তখন তারা মারাং বুরুর কাছে যায় এবং ত্রাণের উপায় প্রার্থনা করে। মারাং বুরু তো হতবাক। তিনি বলেন- তোমাদের ত্রাণের উপায় বলে দিয়েছি আবার এসেছ কেন? পুরুষরা অস্বীকার করে। মারাং বুরু বুঝতে পারেন যে স্ত্রীগণ চাতুরীর দ্বারা পুরুষ বেশে তাঁর কাছে থেকে বিদ্যা অর্জন করেছে। তিনি তখন রুষ্ট হয়ে প্রতিবিধান হিসেবে প্রতি-বিদ্যা পুরুষদের দান করেন। স্ত্রীদের শেখা বিদ্যা কুবিদ্যা বা ডাইন বিদ্যার প্রতিকার করার জন্য পুরুষদের দেন 'জান' বিদ্যা। সেই থেকে পুরুষ 'জানেরা' স্ত্রী 'ডান'দের প্রতিকার করছে।"[৯৩] এরপর থেকেই আদিবাসী সমাজে একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, গ্রামে বা সমাজে কোনো অশুভ বা অঘটন ঘটলে তার পেছনে কোনো নারীর অপশক্তি কাজ করে এবং সেই অপশক্তিকে খোঁজা, বিচার ও শাস্তির ভার পড়ে জানগুরুদের ওপরে। এই ডাইনি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় বন্ধ্যা নারী বা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল মানসিকতার নারীরা মূলত

চিহ্নিত হয়ে যান। সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া দেখিয়েছেন মাটির ওপর লোভ বর্তমানে ডাইনি চিহ্নিতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে- "ছলে-বলে-কৌশলে মাটি নিয়ে নেওয়ার আয়োজন বলি দিতে হয় নারীকেই। তার সংগ্রামী ভূমিকাকেই ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত চলে। 'অপশক্তি' প্রমাণ করার এক আয়োজন শুরু হয়। যেহেতু মহিলাটির আত্মীয়-পরিজন নিকট প্রতিবেশি সকলেরই মাটি-জমির ওপর শ্যেন দৃষ্টি থাকে। তাই লড়াইয়ে কাউকেই কাছে পায় না একাকী মহিলাটি। সে ডাইনি প্রমাণিত হয়ে যেতে থাকে।"[৯৪] *জানগুরু* উপন্যাসে উপরের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। গোলক রক্ষিতের মৃত্যুর পর জমিজমার মালিক হয় তার স্ত্রী। গ্রামে মড়ক লাগলে সেই বউই "ডাইনি" রূপে চিহ্নিত হয়ে যায়। বুড়িকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে গ্রামের লোক। মামীর মৃত্যুর পর সেই জমি-জমার ভাগ পায় আশ্রিত ভাগ্নে গদাধর। এভাবে এককালের নিঃস্ব গদাধর বা গদাই ফুলে ফেঁপে ওঠে। ঔপন্যাসিক লেখেন- "লোকটি বলে, 'গদাই রক্ষিত ইখন শুধু ডাইন খুঁজ্যে বেড়ায়। কারো ঘরে রোগব্যাধি হইলেই সে কথাটা হাওয়ায় ছুঁড়ে দেয়, কোউ খাচ্ছে কিনা দ্যাখ হে। এ যাবৎ, গাঁয়ের আটজনা ডাইন সাব্যস্ত হয়্যে জরিমানা স্বরূপ জমিন দিয়েছে। সব জমিনই গদাই রক্ষিতের দখলে।"[৯৫] গদাধরের মধ্যে নির্লজ্জতা ও লোভকে অতি সূক্ষ্মতায় লেখক গেঁথে দিয়েছেন শুধুমাত্র এই তথ্যে যে, একদিন গদাধরের মাকে ডাইনি সাব্যস্ত করেছিল তার শ্বশুরবাড়ির লোক। সেদিন শিশু গদাধরকে নিয়ে পালিয়ে এসে ভাই গোলকের ভিটেতে ওঠে গদাই বা গদাধরের মা। আশ্রয়দাত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে জমির লোভে। ফুলমতী "ডাইনি" রূপে চিহ্নিত হওয়ার পেছনে কাজ করেছে শুধু তার বন্ধ্যাত্ব নয়, বিধবা সখী সুন্দরীর সঙ্গে তারই স্বামী চুনারামের বিয়ের পরিকল্পনা। এই ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনার পেছনে থাকে সুন্দরীর বাবা গ্রামের অন্যতম মাতব্বর পীতাম বাউরি এবং চুনারাম স্বয়ং।

উপন্যাসে ডাইনি শিকারের নৃশংসতা তুলে ধরেছেন ভগীরথ মিশ্র। ফুলমতী দেখেছে উলঙ্গ করে টাঙ্গিয়ে রেখে বিছুটি লতা দিয়ে মারা হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় গলা দিয়ে যে তীব্র আর্তনাদ ওঠে, তা স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর নয়, হতে পারে না। সেই বিজাতীয় স্বরকে তার মধ্যেকার ডাইনির স্বর বলে চিহ্নিত করা হয়। তারপর একসময় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া দেহটাকে নামিয়ে জল ছিটিয়ে জ্ঞান এনে চলে আরেকপ্রস্থ নির্যাতন। নগ্ন স্তনের মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হয় আগুনের মালসা। পুড়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় সে নিজেকে ডাইনি বলে স্বীকার করে নেয়। তারপর লাঠি, পাথর, আর বল্লমের খোঁচায় মেরে ফেলা হয় ডাইনি। পাশ্চাত্যেও একসময় ডান বা ডাইনি প্রথা ও ডাইনি শিকার প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া তথ্য দিয়েছেন- "১৪৮৪ সালকে ইউরোপের ডাইনি হত্যার জ্বলন্ত বর্ষ বলে মনে করা হয়। তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল ডাইন হত্যা যজ্ঞ। ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে, জলে ডুবিয়ে, জীবন্ত পুড়িয়ে, মাথা কেটে যতটা নির্মমভাবে সম্ভব হত্যা করা হয়েছিল। অবশ্যই অসংখ্য নিরপরাধ মহিলাদের।"[৯৬] তিনি আরও জানিয়েছেন "১৫৭৫ সাল থেকে ১৫৯৭ সালের মধ্যে ত্রিশ হাজারেরও বেশি ডাইনিকে অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয়েছিল সারা ফরাসি রাজ্যে। ১৬৬০ সাল থেকে ১৬৬৪ সাল পর্যন্ত ও সপ্তদশ শতাব্দীর আশির দশকের মধ্যে অন্তত এক লক্ষ নারী-পুরুষকে পুড়িয়ে মারার আদেশ দিয়েছিল জার্মান ইনক্যুইজেশন। সুইডেনে মোরা অঞ্চলে একসঙ্গে বাহাত্তর জন যুবক-যুবতীকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে।"[৯৭] উপন্যাসে লেখক জানগুরুদের ভণ্ডামিকে তুলে ধরেছেন। ছতর বাউরী তার সাগরেদ পচু বাউরীর লুকানো সোনার অলংকার দুখু বাউরীকে দিয়ে গাছের তলা থেকে তুলিয়ে নিয়ে আসে ডাইনি মুক্ত করার অছিলায়। বোবা মেয়ে চুনির মুখে কথা ফোটাতে গিয়ে তাকে সম্ভোগ করে, গর্ভবতী হয়ে পড়ে চুনি। ধীরত পটিদারের বাড়িতে গুপ্তকালীর পুজোর নামে ভোগ করে আরতিকে, বন্ধ্যাত্ব কাটানোর নামে ভোগ

করে মেয়েদের। "ডাইনি" শব্দটির সঙ্গে সযত্নে জড়িয়ে দেওয়া ভয়, নৃশংসতা, শিশুর কলজে খাওয়ার মতো বীভৎসতাকে ভেঙে ফেলেছেন লেখক অনবদ্য বাক্যবন্ধে ও ভাবনায়। সাঁওতাল মনসারামের কিশোর অবস্থায় তার বন্ধু ভিখুর মৃত্যুর জন্য "ডাইনি" হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তার মা মানদাকে। মানদার জোটে চিরজীবনের জন্য মালাই চাকিবিহীন খুঁড়িয়ে হাঁটার শাস্তি আর অপবাদ। ডাইনির ছেলে হওয়ার শাস্তিতে নির্বান্ধব ও স্বজনহীন কেটেছে মনসারামের কৈশোরও। অনবদ্য ভঙ্গিতে লেখক নারীকে ডাইনি হওয়া থেকে মুক্ত করলেন এমন ভাবনায়- "ধিকিয়ে ধিকিয়ে পুড়েছে মনসারাম, মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে বিনিদ্র কাটিয়েছে রাতগুলো, এবং অবাক হয়ে ভেবেছে, মায়ের বুকের মধ্যে সেই পুরোনো মা-মা গন্ধটি আগের মতই অটুট।"[৯৮] মা ও ডাইনি - দুই পরস্পর বিরোধী ধারণাকে একটিমাত্র বাক্যে অনবদ্যভাবে জুড়ে দিয়ে আদিবাসী ও অন্যান্য সমাজে রমরমিয়ে চলা এই প্রথার নগ্নতাকেই প্রকাশ করেন। আইনত নিষিদ্ধ হলেও ভারতে ডাইনি প্রথার শেষ হয়নি, সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া তুলে ধরছেন যে পরিসংখ্যান, তাতে দেখা যাচ্ছে– "ন্যাশান্যাল ক্রাইম রেকর্ড বলছে, (NCRB) ২০০৮ -২০১২ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৭৬৮ জন ডাইনিকে হত্যা করা হয়েছে।"[৯৯] আদিবাসী সমাজে ডাইনি প্রথার চর্চার ভয়ংকরতা উঠে এসেছে আদিবাসী জীবন, সমাজকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোতেও, যেমন– তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মহুলবনীর সেরেঞ* ।

১৯৯৫ সালে প্রকাশিত *মহুলবনীর সেরেঞ* উপন্যাসের সময়কাল সম্পর্কে ঔপন্যাসিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন "এই কাহিনীর সময়কাল ১৯৮৫-৮৬ যেসময়ে নিস্তরঙ্গ, নিরীহ, অথচ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সাঁওতাল জনজীবন উত্তাল হতে শুরু করেছে ঝাড়খন্দ – আন্দোলন।"[১০০] উপন্যাসে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রসঙ্গ থাকলেও তা মূল উপজীব্য হয়ে ওঠেনি; বরং একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীর সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, উৎসব-পরব ইত্যাদির সুরই ধ্বনিত হয়েছে। একটা বিশেষ

অঞ্চলের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনের গান, সমাজ জীবনের ''সেরেঞ''ই *মহুলবনীর সেরেঞ*। সাঁওতালদের বাহা সেরেঞ বা ফুলপরবের গান দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। ''মহুলবনী''র অবস্থান নির্দিষ্ট করলেন ঔপন্যাসিক এইভাবে– ঝাড়গ্রাম থেকে সুবর্ণরেখা নদী পার করে নয়াগ্রামের খড়িকামাথানি। এই খড়িকামাথানি থেকে দু'আড়াই কিলোমিটারের মধ্যে ছোটো গ্রাম মহুলবনী। সেখানে প্রায় সত্তর ঘর সাঁওতালের বাস। এই মহুলবনী গ্রামের মুখে কিছু মাহাতো ও মুণ্ডাদের বাস। সাঁওতাল বসতি শুরুর প্রথম ঘরই সাঁওতালপাড়ার প্রধান মুখিয়া বা মাঝির ঘর। মহুলবনীর মাঝি হরদেব মান্ডি। চাষাবাদ মহুলবনীর সাঁওতালদের মূল জীবিকা হলেও চাষের জমির অভাবে তারা মজুরি খাটতে যায় দক্ষিণে এঁটেল বা দোআঁশ মাটির নাবাল জায়গায়। সেখানে ধান রোয়া ও কাটার মরসুমে মহুলবনী প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। শুধু বুড়ো আর শিশুরা থেকে যায়। মহুলবনী থেকে নাবালে যায় না মুখিয়া হরদেব মান্ডী, পাহান লখীন্দর মুর্মু। চাষাবাদের মূল পেশার মধ্যেও পড়াশোনা করে অন্য পেশায় গেছে সনাতন বেসরা, সহদেব সোরেন ও অঘোর মুর্মু। সনাতন বেসরা রেল্যাগেড়িয়া গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। সহদেব সোরেন হাইস্কুলে ঘণ্টা বাজানোর কাজ করে আর অঘোর মুর্মু বর্ধমানের কোনো এক থানার কনস্টেবল। উপন্যাসে মহুলবনীর জীবন-জীবিকাই শুধু নয়, উঠে এসেছে সামাজিক বিন্যাস, উৎসব, বিশ্বাস, সংস্কার, গোষ্ঠীগত রাজনীতি ও সর্বোপরি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার কথা।

মহুলবনীর পরজানবুড়ো সুযোগ পেলেই ছোটোদের শোনাতে থাকে সাঁওতালদের উৎপত্তির, তাদের বারোটা গোত্রের জন্মের কাহিনি। পরজানের মনে হয় তাদের যৌবন বয়সের সময় থেকে বর্তমানে সময়ে দ্রুত বদলে যাচ্ছে মহুলবনী। এই দুর্বল হয়ে যাওয়া শিকড় পরজানের কাছে একইসঙ্গে ভয়ের ও ঘৃণার- ''রকম বদলে গেছে গোটা মহুলবনীরই। জঙ্গলের মানুষ প্রথমে হ্যাচাক, তারপর

ইলেকটিরির আলোর ঝলকানিতে খসিয়ে ফেলছে তাদের গায়ের আদিম বাগল। সব বাবু হয়ে যাচ্ছে। থু থু -।"[১০১] বদলে যাওয়ার কারণ সে অনুধাবন করে দেখেছে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর তৈরি হওয়া নতুন ব্রিজ, যার ফলে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়েছে এবং সাঁওতালদের নিজস্ব কৌমজীবনচর্চা ও শিক্ষার বদলে মূলস্রোতের শিক্ষা সাঁওতালদের মধ্যে ঢুকে যাওয়া। তাই মূলস্রোতের সঙ্গে মিশতে চাওয়া সাঁওতালদের শিকড়ের গল্প শোনায় পরজান, হাঁস আর হাঁসিলের গল্প। H. H. Risley লিখছেন- "Santal tradition traces back the origin of the tribe to a wild goose (*hasdak*) which laid two eggs. From these sprang Pilchu Haram and Plichu Burhi, the parents of the race, who begat the first seven sub-tribes."[১০২] সাঁওতালদের মধ্যে যে বারোটা গোত্র আছে তাকে রিজলে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে- "The internal structure of the Santal tribe is singularly complete and elaborate. There are twelve exogamous septs, (1) Hasdak, (2) Murmu, (3) Kisku, (4) Hembrom, (5) Mandi, (6) Saren (7) Tudu, (8) Baske (9) Besra, (10) Pauria, (11) Chore, (12) Bedia. The first seven are believed to be descended from the seven sons of Pilchu Haram and Pilchu Burhi or Ayo. The five others were added afterwards."[১০৩] উপন্যাসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সনাতন বেসরা ভালোবাসে পঞ্চায়েত প্রধান প্রহ্লাদ টুডুর মেয়ে পারিজাকে। কিন্তু সাঁওতাল সমাজে "বাপলা" বা বিয়ের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতি, নিষেধাজ্ঞা আছে। জাত-পাতের সমস্যা আছে। সনাতন জেনেছে বেসরাদের সঙ্গে টুডুদের বিয়ে স্বীকৃত নয় সাঁওতালদের মধ্যে। শিক্ষিত সনাতন এই জাত-পাতকে অস্বীকার করতে চায়। প্রহ্লাদ টুডুর সঙ্গে জাত-পাত নিয়ে তর্ক করার পূর্বে তাই সে ভালো করে জেনে বুঝে নিতে চায় সাঁওতালদের

গোত্র বিভাজনকে- "হাঁস ও হাঁসিল থেকে পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ির জন্ম হওয়ায় মূল আদিবাসীদের বলা হয় হাঁসদা। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে যারা শিং গুঁড়ো করেছিল, তারা মান্ডি। যারা চিল মেরেছিল তারা সোরেন। যারা হরিণ বয়ে এনেছিল তারা হেমব্রম, যারা পেঁচা মেরেছিল তারা টুডু। যারা মাছরাঙা মেরেছিল তারা কিসকু। যারা বাসিভাত দলা পাকিয়েছিল তারা বাস্‌কে। যারা মাথার উপর ছাতা ধরেছিল তারা বেস্‌রা। যারা ধারালো-গলার বাজপাখি মেরেছিল তারা কোড়া। যারা ঘুঘু মেরেছিল তারা পাউরিয়া। যারা ঘনলোমের বানর মেরেছিল তারা ডোঙ্কা বা ভাদুলি। আর যারা এইসব আদিবাসীদের পুরোনো ধারা ফিরিয়ে এনেছিল, তারা মুর্মু।"[১০৪]

সাঁওতাল জীবনের সঙ্গে গান ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান বা উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা সুরের অসংখ্য গান জড়িয়ে আছে সাঁওতাল কৌম জীবনকে। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে এমনই সব পরব ও সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সেই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গানকে তুলে আনলেন। লেখক সাঁওতালদের ধর্মীয় বিশ্বাস তুলে ধরেছেন এইভাবে-

- "ক'টা সারজম গাছ। তার সামনে উঁচু মাটির ঢিবি। ঢিবির পেছনে পর-পর কয়েকটা পাথরের খণ্ড পোতা। এক-একটা পাথর এক-একজন মুখিয়া বা মাঝির নামে, মরে যাওয়ার পর মুখিয়ারা সব বঙ্গা হয়ে যায়। বঙ্গা হয়ে শুয়ে থাকে মাটির নীচে। গাঁয়ের তাবৎ 'হড়' মাঝিথানের সামনে এসে গড় করে, বঙ্গাদের পুজো দেয়।"[১০৫]
- "গাঁয়ের পছিমদিকে জাহের থান। সেখানে পরবের উঠোন। পাহান লখীন্দর মুর্মু নিয়ম করে মহুলবনীর জাহের থানে পুজো দেয় বঙ্গাদের উদ্দেশ্যে। পুজো দিয়ে, বলি দিয়ে ঠাণ্ডা রাখে বঙ্গাদেবতাদের, পুজো না দিলে গাঁয়ের মানুষেরা সব 'রুয়ো'য় ভুগবে।"[১০৬]

এছাড়াও, মারাং বুরু ও জাহের এরার প্রসঙ্গ এনেছেন। রিজলে জানিয়েছিলেন- "(1) Marang Buru, the great mountain or the very high one, who now stands at the head of the Santal Pantheon, and is credited with very far-reaching powers, in the virtue of which he associates both with the gods and with the demons (2) Moreko, fire, now a single god, but formerly known to the Santals under the form of five brothers. (3) Jair Era, a sister of Moreko, the goddess of the sacred grove set apart gin every village for the august presence of the gods."[১০৭] জাহের থান সাঁওতালদের পরবের থান। যে কোনো পরবের আগে এখানে পুজো দেওয়া হয় নির্দিষ্ট দেবতার। বাহা পরবের পূর্বে জাহের থান পরিষ্কার করেছিল কাজল, পার্বতী ও হীরা। জাহের থানের প্রসঙ্গ উপন্যাসে আছে এইভাবে- "হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন জাহের থানের পথ ধরেছে সহদেব। গাঁয়ের পছিমদিকে পাশাপাশি সাত-আটটা বিশাল আকারের সারজম গাছ। তার ঠিক মাঝখানের দুটো সারজম সবচে উঁচু। একটা মারাং বুরুর, অন্যটা জাহের এরার। মারাং বুরুর পাশেই থাকে জাহের বুড়ি। বাকি সারজম গাছগুলো এক-একজন বঙ্গার নামে। আরও তো পাঁচ-ছ'জন বঙ্গা আছে। তাছাড়াও আছে গোঁসাই এরা, পরগনা বঙ্গার নামে গাছ। জাহের বুড়ির মতো গোঁসাই বুড়িকেও পুজো দেয় ওরা। জাহের থানের ঠিক পিছনে অনেকখানি সারজম-জঙ্গল। সে গহীন জঙ্গলে থির হয়ে থাকে রাশ রাশ অন্ধকার।"[১০৮] আশ্বিন মাসে হয় সাঁওতালদের দাঁশায় পরব। দাঁশায় পরবে যে গান গাওয়া হয় তার দু'টো ভাগ- ভুয়াং ও লবয়। অন্যতম উৎসব সহরায় পালিত হয় সাধারণত পৌষ মাসে- "This festival is also known as *Bundhna* or *Banda.* It is celebrated in the month of *Pous* (December- January) after the winter paddy has been harvested but it

must be completed before the last day of the month of *Pous* (mid January) or before the full-moon night of the *Pous.*"[১০৯] উপন্যাসের সূচনায় পাই, সাঁওতাল কৌমজীবনের দ্রুত পাল্টে যাওয়ার অনুভব প্রকাশ পাচ্ছে মহুলবনীর পরজানের ভাবনায়। মকর পরবে বেশিরভাগ সাঁওতাল যুবক-যুবতি উপস্থিত না থাকায় ক্ষুব্ধ মুখিয়া সভা ডাকেন। স্থির হয়, বেশিরভাগ মানুষ নাবালে কাজ করতে যাওয়ায় মকর পরবে থাকতে পারেনি, ফলে পরবর্তী বাহা উৎসব জাঁকজমকের সঙ্গে হবে। বাহা সাঁওতালদের বিশেষ পরব। ফাল্গুন মাসে শাল গাছে যখন ফুল আসে, তখন এই পরব অনুষ্ঠিত হয়। "Next in importance is the *Baha puja,* kept in the Phalgun (February-March) when the *sal* tree comes into flower."[১১০] বাহা পুজো না করা পর্যন্ত সাঁওতালরা শাল, মহুয়া, পলাশ বা অন্য কোনও ফুল কুড়োতে পারে না। বাহা পুজো ও পরবের অন্যতম উপাদান বাহা গান। উপন্যাসে দু'দিন ধরে এই পরব পালনের চিত্র আছে। অবশ্য সনাতন রাঁচি থেকে আরও পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে পাহাড়তলির তলার কাছে পিতৃপুরুষের স্বভূমির সন্ধান করতে গিয়ে সেখানকার সাঁওতালদের দেখেছে তিন-চারদিন ধরে বাহা পালন করতে। এই পূজা পালনের রীতি সম্পর্কে জানা যায়- "The festival starts with purification ceremony (*Um*). After this all assemble in the *Jaherthan* and the priest worships the deities and spirits in the *Jaharthan.* The *Bonga Lagao* or the spirit possession ceremony takes place in the evening in the house of the *Naeke* when everyone songs *Baha* songs"।[১১১] উপন্যাসের শুরু এই বাহা পরবের গান দিয়ে। ঔপন্যাসিক পরজানবুড়োর মুখে বসিয়েছেন এই গান। অঘোর মুর্মুর আমন্ত্রণে মহুলবনীতে বাহা পরব দেখতে গেছে গ্রামের হাসপাতালের নতুন ডাক্তার। "দেকো"-দের (দিকু) প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস মিলিয়েই মহুলবনী

সাঁওতালপাড়া গ্রহণ করেছিল অলক্তককে। অতিথির যোগ্য সম্মান দিয়েছে। সেইদিনই অলক্তক অঘোর মুর্মুর স্ত্রী সহেলিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে, সন্তান আকাঙ্ক্ষায় হাসপাতালে স্বামীর সঙ্গে ডাক্তার দেখাতে আসা লজ্জায় গুটিয়ে থাকা সহেলি নয়, আত্মসচেতন সহেলি। উপন্যাসে এসেছে শিকার পরবের প্রসঙ্গ, সেই প্রসঙ্গ ধরেই ঔপন্যাসিক সহদেবের মনের হদিশ দিয়েছেন পাঠকের কাছে। শালঘেরীর রায়নার প্রতি ভালোবাসায় দুর্বল সহদেব রায়নার হৃদয় জিতে নিতে চেয়েছে তির-ধনুকের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে। শিকার পরবে শালঘেরীর রামলালকে ছেড়ে দিয়েছে শিকারের অধিকার। শিকার পরবে গাওয়া গান ‘‘বির সেরেঞ’’। “সারু গাজাড় কিকির বিং দ/ কিকির বিং দোএ সার আকানা...।”[১১২] গান শোনান লেখক আহার হেমব্রমের মুখে। সে আরও গেয়েছে বাপলা বা বিয়ের গান- মেয়ে বাবার ঘর ফাঁকা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে- “হপন এরা বিদায় ওদোক্/ ওরাঃ নিজুলেন বাবা ওরাঃ নিজুনেন...।”[১১৩] উপন্যাসে সাঁওতালদের বিয়ের আচার ও রীতি-নীতি আছে কাজলার বিয়েকে কেন্দ্র করে। বিয়ের দিন সকালে হয় “জল বিয়ে” বা ‘‘দাক-বাপলা’’। একটা গর্তে জল রেখে তাতে পুঁতে দেওয়া হয় তিনটে তির। তিরের ফলায় লাগানো হয় সিঁদুর, গোড়ায় রাখা হয় কিছু ঝিনুক ও একটা ডিম। মারাং বুরু ও পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে হাঁড়িয়া দেওয়ার পর এই গর্তের জল এক ঘটি জল তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বিয়ের কাজের জন্য। শামিয়ানার নীচে দূর্বা ঘাস দিয়ে হলুদ লাগানো হয় কাজলের গায়ে, মুখে। পাত্র ও শ্বশুর পরস্পরকে সম্মান জানায়, পান দিয়ে কুশল বিনিময় করে। এরপর সিঁদুর পরানোর মধ্যে দিয়ে বিয়ের মূল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

কাজলের বিয়ের অনুষ্ঠানে যে চরিত্রটি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে হল ডাকোহিলি। সকলের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারা এই মজার মানুষটি কাজলার বিয়ের কাজগুলো করে ফেলে অবলীলায়, দায়িত্বসহ। প্রায় প্রতিটি পরবের মতো সাঁওতালদের বিয়েতেও একটা প্রধান উপকরণ

হাঁড়িয়া। মহুয়ার রসের "মৎকম"। কাজলের বিয়ের আগের দিন সেই হাঁড়িয়া ও মৎকম তৈরির জন্য মহুয়া জোগাড় করতে চিকনশিরির জঙ্গলে যায় ডাকো। সঙ্গে পার্বতী, ময়না ও ছলিয়া। গভীর জঙ্গল বাকি যুবতিদের কাছে ভয়ের হলেও ডাকোর কাছে তার অন্য অনুভবের- "জঙ্গলে এলে মানুষ বোধহয় এমন আলাভোলা আর উদাসীন হয়ে যায়। ঘরের কথা ভুলে যায়। ঘরের মরদের কথাও আর মনে থাকে না। তখন মানুষ একা হয়ে যায়। এমন একা হতে ডাকোর ভারী ভালো লাগে। দেখা হয়ে গিয়েছিল এক আন্‌কা মরদের সঙ্গে।"[১১৪] সেই মরদের সঙ্গে এক হওয়ার ভালোলাগা বহু দিন পরেও ডাকোর মনে জীবন্ত ছিল। কাজলের বিয়ে উপলক্ষে মহুয়া সংগ্রহে গিয়ে সেই পুরুষটিকে খুঁজেছে ডাকো। কিন্তু, সেই পুরুষের বদলে সে খুঁজে পেয়েছে কামনায় দগ্ধ হওয়া মুখিয়াকে। জঙ্গলের গভীরে ডাকোকে ভোগ করে মুখিয়া, আর অন্ধ সংস্কারে ডাকো খুশি হয়েছে এই ভেবে যে, মুখিয়া সাঁওতালদের কাছে বঙ্গাস্বরূপ (দেবতাস্বরূপ), তার কাছে গ্রহণ হওয়া ভাগ্যের, পুণ্যের। অবশ্য ক্ষমতার কারবারিরা এই বিশ্বাস নির্মাণ করতে, বাঁচিয়ে রাখতে চায়। পরবর্তীকালে সহেলি ও ডাক্তার অলক্তকের সম্পর্ককে ঘিরে মুখিয়া "গিরা" ডাকলে ডাকো তার বিরোধিতা করে। মুখিয়াকে মনে করিয়ে দিতে চায় অন্যের স্ত্রীর ধর্মনাশ করেছিল মুখিয়া স্বয়ং। তার উত্তরে হরদেব মুখিয়া বলে- "হরদেব এবার হঠাৎ গলা নামায়, না, মুখিয়া 'ভরম' লিলে তা দোষ লয়। সিটা তার ভাগ্যি।"[১১৫] ডাকো মুখিয়ার ক্ষমতার রাজনীতির পথে বাধা বুঝে কৌশলে তাকে সে কৌশলে "ডান" বানিয়ে তোলে। অন্ধ সংস্কারে ও ভয়ে মহুলবনীর সকলে বিশ্বাস করে নেয় তাদের সকলের প্রিয়, মজার মানুষটাও কখন হয়ে উঠেছে "ডাইনি"। তাই মারা গেছে গরু, মংলা কিসকুর ছেলের অসুখ সারছে না রামু ওঝার ওষুধে। অবশ্য রামু ওঝার ওষুধে আগেও রোগ সারেনি মহুলবনীর মানুষের। কিন্তু এই মুহূর্তে সবচেয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে ডান-ভীতি। যুক্তি-তর্ককে ছাপিয়ে যায় অন্ধ বিশ্বাস। চিরচেনা

মানুষগুলোকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে হাত কাঁপে না কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলোর- মারা যায় ডাকো ও তার স্বামী রামদাস। আদিবাসী সমাজের নিষ্ঠুরতম চিত্র উঠে আসে ডাকোর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে।

যে রামু ওঝার সাহায্যে মুখিয়া ডাকোকে "ডান" সাব্যস্ত করে, তার পরিচয় অবশ্য পাঠককে আগেই দেন ঔপন্যাসিক। ডাক্তার অলক্তকের মহুলবনীতে "আউটডোর" করার প্রস্তাবে সবচেয়ে অখুশি হয়েছিল রামু ওঝা। ডাক্তারের আউটডোর শুধু তার একচ্ছত্র অধিকারকেই ক্ষুণ্ণ করেনি, তার ব্যর্থতাকেও প্রকাশ করে দিয়েছিল। সনাতন ও সহদেব একত্রে রামু ওঝার ওষুধের অকার্যকারিতা তুলে ধরেছিল প্রকাশ্যে- "সনাতন খুব একরোখা ছেলে। জেদি কোড়া বলে গাঁয়ের লোক তাকে বেশ সমীহ করে। সে যখন একবার বলেছে, গাঁয়ের ভেতরে আউটডোর হবে, তো হবেই। সে ঝেঁকে উঠে বলল, রামু ওঝার 'রানে' কুঠও সারে না, টি বিও সারে না। সেই তো সবাইকে হাসপাতালেই ওষুধ আনতে ছুটতে হয়।"[১১৬] পরবর্তীকালে ডাক্তার অলক্তকের সঙ্গে সহেলির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আউটডোর বন্ধ হয়, বন্ধ করে দেওয়া হয় হাসপাতালে যাওয়া। মংলা কিস্কুর ছেলের চিকিৎসা করে রামু ওঝা। আগের মতো সেই ওষুধে কাজ হয় না। কিন্তু নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে মুখিয়ার সহযোগিতায় রামু ওঝা সব দায় চাপিয়ে দেয় "ডাইনি" ডাকোর ওপর। শুধুমাত্র সমাজের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা বজায় রাখার রাজনীতি নয়, ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় থাকা মানুষের আর্থিক অনৈতিকতাকে, স্বজাতির প্রতি বঞ্চনাকে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কালাচাঁদের দুর্বলতার সুযোগে পঞ্চায়েতের টাকা তছরুপ করেছে পঞ্চা বেসরা। বাস্তবতাকে অস্বীকার করে সাঁওতাল মানুষদের নামে এমন প্রকল্পের টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, যা বাস্তবায়িত করতে তারা অপারক। এই ভুল প্রকল্পের বণ্টন মহুলবনীর মানুষদের আর্থিক তথা সার্বিক উন্নতির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে না-

আই.আর.ডি.পি-র মিটিং-এ বাইশ জনের নামের তালিকা তৈরি হলেও স্কিমের টাকা মঞ্জুর হয় চারজনের নামে-

"এমন একজনের নামে মাছ-চাষ করার স্কিম স্যাংশন হয়েছে, যার পুকুর বছরের আটমাস শুকনো তাকে। সেই মঙ্গল হাঁসদা বলল, বুঝলি সনাতন, মাছ চাষ তো হবেনি। বরং একটা সাইকেল কিনে নি। মহেন্দ্র কিসকুর নামে এসেছে চানাচুর ভাজার স্কিম। শিরিষ মুর্মুর নামে বিড়িবাঁধা। দুজনেই গালে হাত দিয়ে বসে আছে। মহেন্দ্র কিসকু তো বলেই বস্‌ল, চানাচুর ভাজা কি মুইদের 'কৌমি'। সে তো শহরে হয়। লোন নেবনি গো, লোন নিলে শেষে কী না কী হয়! শিরিষ মুর্মু বলছে, সে ঝাড়গ্রাম যাবে বিড়ি বাঁধা শিখতে।"[১১৭] একমাত্র নরেন হাঁসদার নামে এসেছে পোলট্রি করার টাকা, সেই টাকা দিয়ে ব্যবসার জন্য সে কিনে এনেছে অনেকগুলো মুরগির বাচ্চা। দিনের পর দিন ক্ষমতাবান মানুষের হাতে নিষ্পেষিত সাঁওতালদের দুরবস্থা সনাতনের মনে যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল, জঙ্গলের সামান্য কাঠ কুড়ানোর অপরাধে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে পার্বতীর ওপর ঘটা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সেই ক্ষোভের বারুদে অগ্নি সংযোগ করে। আদিবাসীদের জন্য পৃথক রাজ্য "ঝাড়খণ্ড" গঠনের দাবি তো ছিলই, এবার সনাতন প্রত্যক্ষভাবে সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। সনাতনের "হুল দিবস"-এর ভাষণ ছিল সাঁওতাল স্বার্থ বিরোধী রাজনীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রতিবাদ।

উপন্যাসে এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর সমাজ-জীবন-সংস্কার এবং তাকে ঘিরে থাকা রাজনীতিকে তুলে আনলেও লেখক উপন্যাসের মূল সুর বেঁধেছেন মানুষ-মানুষীর সম্পর্কে। সনাতন-পারিজা, সহদেব-রায়না, অলক্তক-সহেলি – এই তিনটে ভালোবাসা বা ভালোবাসার মতো সম্পর্ক শেষে একই বিষণ্ণতায় মিলে যায়। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত সনাতন অনেকদিন পরে গ্রামে ফিরে খবর পায় পারিজার বিয়ে হয়ে গেছে। সহদেব শালঘেরীর যে যুবতির হৃদয় তির চালানোর

পারদর্শিতায় জিতে নিতে চেয়েছিল, এক বছরের কঠিন অধ্যবসায়ে তারই খবর রাখেনি। সহদেবের জন্য অপেক্ষা করতে করতে একদিন রায়নোর বিয়ে হয়ে যায়। চাঁদমারির নিপুণ নিশানা ব্যর্থ হয়ে যায়- "এক প্রবল হতাশায় আক্রান্ত সহদেব আচ্ছন্নের মতো চলে এল রায়নার কাছ থেকে । সে কেবল মাথা নেড়ে চলেছে একা-একা। পাগলের মতো মাথা নাড়ছে। সে পারেনি, জিততে পারেনি। সে হেরে গেছে। একদম ডাহা ফতুর।"[১১৮] হাসপাতালের নতুন ডাক্তার, মহুলবনীর সুহৃদ অলক্তক-সহেলির সম্পর্কের কাহিনি শেষ হয়েছে অলক্তকের চলে যাওয়া, একপ্রকার পালিয়ে যাওয়া ও সহেলির আত্মহননের করুণ পরিণতিতে। উপন্যাসে সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র সহেলি সরকারি চাকুরে "কনস্টেবল" অঘোর মুর্মুর স্ত্রী। অলক্তককে ডাক্তার হিসেবে সর্বোচ্চ গরিমা দিয়েছেন লেখক। হাসপাতালের পূর্বতন ডাক্তারের শুধুমাত্র টাকা উপার্জনের বিপরীতে অলক্তক সেবাধর্মে প্রতিষ্ঠিত। তার হাসপাতালে যোগদান করার পর রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। মহুলবনীর মানুষের জন্য রবিবার করে বিনামূল্যে আউটডোর করতেও উদ্যোগী হয়েছে সে। দারিদ্র্য, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মায় পীড়িত মানুষের পাশে থাকার অনুভব ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে- "অলক্তকের নিজেরও খুব ভালো লাগছিল। গোটা গাঁয়ের লোক যেভাবে তার এই হাসপাতাল দেখতে এসেছে, অসুখ দেখিয়ে নিচ্ছে, তাতে সে দারুণ খুশি। ডাক্তারী পড়বার সময় তার বাবা বলেছিলেন, ডাক্তার হওয়া শুধু টাকা রোজগারের জন্য নয়, তুমি ডাক্তার হচ্ছ মানুষের সেবা করার জন্য। আমি তাই চাই। টাকা তো আলু বিক্রি করেও রোজগার করা যায়।"[১১৯] মহুলবনীকে কাছ থেকে দেখার সুবাদে আদিবাসী এই গ্রাম ও মানুষগুলোর প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয় অলক্তকের। অভাব ও রোগের মধ্যে থেকেও মানুষগুলোর অফুরন্ত আনন্দের যাপন তাকে বিস্মিত করেছে- "মহুলবনী তার কাছে এক নতুন আবিষ্কার।"[১২০] সেই আবিষ্কারের একটা আবিষ্কার অবশ্যই সহেলি। অলক্তকের কাছে সহেলি আর পাঁচটা সাঁওতাল নারীর মতো নয়, অন্যরকম। সহজভঙ্গিতে

মানুষের সঙ্গে মেশার ক্ষমতার পাশাপাশি তার কৌতূহলী চোখ বাকিদের থেকে তাকে আলাদা করেছে। কাজলের বিয়ের রাতে সহেলির সঙ্গে অলক্তকের শারীরিক মিলন কোনো আকস্মিক কামনাজাত নয়, সহেলির প্রতি অলক্তকের আকর্ষণের খবর লেখক আমাদের পূর্বেই দিয়েছেন। কিন্তু, সহেলির মনের এমন আকর্ষণের খবর আমরা পাই না। একাকিত্ব ও সন্তানের আকাঙ্ক্ষাই বরং তীব্র সহেলির মধ্যে। মা হওয়ার আনন্দকে তার দেহে-মনে প্রত্যক্ষ করেছিল অলক্তক- "অলক্তক দেখছিল, সহেলির শরীরে মা হওয়ার সব লক্ষণগুলো ফুটে উঠেছে আস্তে আস্তে। মুখে একটা অন্যরকমের লাবণ্য। আরো হাসিখুশি লাগছে তাকে, তার সঙ্গে একটা লজ্জা-লজ্জা অনুভূতি।"[১২১] সাঁওতাল সমাজে ভালোবাসার স্বাধীনতা ও নিষেধের কড়াকড়ি পাশাপাশি অবস্থান করে। অলক্তকের সম্পর্কে প্রথম ক্ষোভ উজাড় করেছিল রামু ওঝা। সহেলির মা হওয়ার সূত্রে সহেলি ও অলক্তকের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ককে উপলক্ষ করে ডাক্তারের মহুলবনী থেকে বিদায় সুনিশ্চিত করে নিজের প্রাধান্যকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল রামু। অলক্তকের ওষুধে হীরার দীর্ঘদিনের যক্ষ্মা সেরে উঠেছিল। রামু ওঝার ওষুধে না সারা কুষ্ঠ ও যক্ষ্মায় পীড়িত মহুলবনীকে প্রায় সারিয়ে তুলেছিল ডাক্তার। ফলে, ডাক্তারকে নিয়ে বিচারে দ্বিমত ছিল। ডাকোহিলির মতো অনেকেই বিশ্বাস করত ডাক্তার অলক্তক দেবতাস্বরূপ। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতিতে ডাকোহিলিরা সংখ্যালঘু। তাদের "ডাইনি" হয়ে মরতে হয়। অঘোরকে অসম্মানিত হতে হয়। অঘোরের অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও সহেলির বিচার হয়। শেষপর্যন্ত অলক্তককে জীবন বাঁচাতে এস.ডি.ও'র গাড়ি চেপে খড়িকামাথানি ছাড়তে হয় আর সহেলিকে আত্মহত্যা। সহেলির করুণ পরিণতি *মহুলবনীর সেরেঞ্জ*-কে বিষাদের এমন সুরে বেঁধেছে, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের স্বর সেখানে চাপা পড়ে যায়।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি উপন্যাস *টাঁড় বাংলার উপাখ্যান* (২০০০) শুরু হয় রাজনৈতিক হত্যা ও প্রতিহত্যার মধ্যে দিয়ে। পুরো উপন্যাসজুড়ে একটা বিশেষ সময় ও বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রাধ্যান্য লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক হত্যার উত্তাপ ও চাপানউতোরের মধ্যেই ঘটনার বাঁক ঘোরে "অপারেশন বর্গা"র প্রসঙ্গ ধরে। পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিসংস্কারের কাজ শুরু হয় ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর। সেই সময় রাজ্যের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন বিনয় চৌধুরী। ভূমিসংস্কার দপ্তরের কমিশনার দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্যায়ে ভূমিসংস্কারের অন্যতম কর্মসূচি ছিল বর্গাদারদের নাম নথিভুক্তকরণ। তেভাগা আন্দোলনের পরই অবশ্য প্রণীত হয়েছিল বর্গাদারি আইন। কিন্তু আইনের ফাঁক গলে প্রায় মুছে যেতে বসেছিল বর্গাদারদের ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের দাবি – "১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত সেট্‌লমেন্ট রেকর্ডে বর্গাদারের অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না। পরন্তু, ভূমিসংস্কার আইন (১৯৫৫) বলবৎ হওয়ার সাথে সাথে মাঝারি ও ছোট জোতের অনুপস্থিত মালিকেরা জমি নিজ-চাষে আনার অজুহাতে বর্গাস্বত্বের ব্যাপক উচ্ছেদ ঘটাতে থাকে আইনের সহায়তা নিয়েই।"[১২২] ফলে, প্রয়োজন ছিল জোরালো প্রচার ও সচেতনতা গড়ে তোলার। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৭৮ সালের মে মাসে দু'টো ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় থানার বেলদা ও হুগলির পোলবা থানার হালুসাই গ্রামে। তিনদিনব্যাপী আলোচনায় বর্গাদার নাম নথিভুক্তকরণ করার ক্ষেত্রে যে বাধাগুলোর কথা উঠে আসে তা নিম্নরূপ-

নাম নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া চলত দিনের বেলায়, যখন কৃষকেরা চাষের কাজে মাঠে ব্যস্ত থাকত। প্রক্রিয়াটা সংঘটিত হত জমিদারদের বৈঠকখানায়, ফলে সেখানে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করানোর বাস্তব সমস্যা ছিল ভয়।

এই আলোচনা থেকেই "অপারেশন বর্গা" শব্দদ্বয় উঠে আসে এবং ১৯৭৮ সালের জুন মাসে এই কর্মসূচি সফল করার জন্য যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে স্থির হয়, তা হল –

"(১) বিভিন্ন কৃষক সংগঠন মারফৎ অগ্রাধিকার-ভিত্তিক অঞ্চল স্থির করা অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বে গঠিত কৃষক সংগঠনগুলির সুপারিশে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বর্গাদার-প্রধান মৌজা চিহ্নিত করা;

(২) ভূবাসন ও ভূমিসংস্কার বিভাগের কর্মীদের নিয়ে স্কোয়াড গঠন করা;

(৩) বর্গাদারদের নিয়ে সান্ধ্য সভা করা;

(৪) মাঠে মাঠে সরেজমিনে তদন্ত করা; এবং

(৫) বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করা, নথিভুক্তকরণের কাজে ভূমিসংস্কার আইনের ৫১ নং ধারা অনুযায়ী পুরোপুরি প্রশাসনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা।"[১২৩]

এই উপন্যাসে অপারেশন বর্গার প্রসঙ্গ আসে কেশরং থেকে আসা একটা ফোন ও রঙিন হাঁসদা নামক এক বর্গাদারের অধিকারচ্যুত হওয়ার ঘটনা থেকে। ভাগচাষিদের বঞ্চনার নজির আরও প্রকট হয় উপন্যাসে জমিদার রাজকিশোর সিংহ সাহসরায় প্রসঙ্গে। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ আইন পাশ হয়। সেখানে বলা হয়, জমিদারের প্রজারা সরাসরি রাষ্ট্রের প্রজা বলে গণ্য হবে এবং জমিদাররা সর্বোচ্চ ২৫ একর কৃষিজমি ও ১৫ একর অকৃষিজমি রাখতে পারবে। তাই, উপন্যাসে দেখি রাজকিশোরের কাজলডাঙ্গা মৌজার জমি হত্যুকি দাস নামক জনৈকের নামে। নিজ-চাষ নামে। অথচ, সেই জমিতে পুরুষানুক্রমে চাষ করে আসছে সাঁওতালরা। রবিচাঁদ সোরেন, একলব্য সোরেন, দিকলা টুডু প্রমুখেরা। বর্গাদার হিসেবে তাদের নাম সরকারি খাতায় ওঠেনি; শুধু রাজকিশোর উঠতে দেননি নয়, সাঁওতালরাও মনে করেছিল "রাজাবাবু" অসময়ে যে ধানটুকু দিয়ে

সাহায্য করেন তা চলে যাবে। সর্বোপরি, তিন-চার পুরুষ ধরে চলে আসা রাজবাড়ির হাতটা মাথার ওপর থেকে সরে যাবে। সচেতনতার অভাব স্পষ্ট করেন ঔপন্যাসিক এইভাবে– "সারাদিনের খোরাকি হিসেবে সকালের মুড়ি আর লঙ্কা, দুপুরে পেটভর ভাত, দিনের শেষে মজুরি হিসেবে কটা টাকা।...যে সময় চাষ থাকে না, ঘরে খাবার বলতে কিছু থাকে না, তখন রাজাবাবুর কাছে গিয়ে চাইলে দু-চার পালি ধান দিয়ে দেন। অবশ্য বিনিময়ে টিপছাপ নিতে ভোলেন না।"[১২৪] সরকারকৃত "মিনিমাম ওয়েজেস" আইন প্রহসনের মতো শোনায়। রাজকিশোরকৃত বঞ্চনা সম্বন্ধে সাঁওতাল প্রজাদের সচেতন করার চেষ্টা করে বালক নন্দী। বালক নন্দীর একটা রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে। উপরন্তু তার সঙ্গে রাজকিশোরের ব্যক্তিগত সমস্যার জায়গাও রয়েছে। যদিও তা ছাপিয়ে ওঠে বর্গাদারদের অধিকারের প্রসঙ্গটি। কাজলডাঙার জমির দক্ষিণে মোট একুশ ঘর সাঁওতাল, সবাই কাজলডাঙার জমিতে চাষ করে না, কেউ কেউ আরও পশ্চিমের জমি বিরকাঁড় মৌজার জমিতে। অবশ্য এখানে চাষ করা টিহড় মুর্মু, নিহাল টুডু, গনেশ বেস্‌রা, কিসকু দিগরদের নাম বর্গাদার হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। কাজলডাঙা ও বিরকাঁড়ের মধ্যে লালতাকুঁড়িতেই জমিদার রাজকিশোরদের বিরাট রাজবাড়ি। এই অঞ্চলে সাঁওতালদের প্রজা হিসেবে বসিয়েছিলেন রাজকিশোরের বাবা সম্রাটকিশোর। সাঁওতাল পাড়ার যে খবর ঔপন্যাসিক দিলেন, তাতে জানা যায় চাষে সংসার চলে না বলে কেউ কেউ সরকারি প্রকল্পের টাকা নিয়ে বাবুইঘাসের দড়ি বোনে, কেউ কেউ ছাগল পালন করে। সাঁওতালপাড়ার মাঝি বা প্রধান জগন্নাথ মুর্মুর ছেলে প্রহ্লাদ গ্রামে স্কুল খুলে অলচিকি শেখায়, সেখানে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আসে লোধা, মুণ্ডা, ওঁরাওদের ছেলেরাও। তবে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা কঠোরভাবে সমাজের ট্যাবু মেনে চলে। সাঁওতাল বিধবা যুবতি চাঁদমণির সঙ্গে ওঁরাও যুবক পারলসের সম্পর্ককে তারা মেনে নেয়নি, তেমনই কেশরঙের সাঁওতালরা অনাদিবাসী

বর্ণর সঙ্গে তাদের সাঁওতাল মেয়ের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে ‘‘কুলহি’’ ডেকে জরিমানা করেছিল ও নিখোঁজ বর্ণের খোঁজ করতে গিয়ে পরিবারকে শাসিয়ে এসেছিল। সাঁওতালদের সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে প্রহ্লাদ মুর্মুর মুখে সাঁওতালি যাত্রাপালার কথা পাঠক জানতে পারে।

যে কাজলডাঙার পঁচিশ বিঘে শালি জমিতে ছিল সাঁওতাল প্রজাদের একচ্ছত্র অধিকার ছিল, বর্গাদারি আইনকে এড়িয়ে যেতে সেই মাঠে রাজকিশোর চাষ করতে অন্য ‘‘মুনিশ’’ লাগায় এবং তা ইচ্ছেকৃতভাবে লোধাদের, দিখু দিগারের নেতৃত্বে। লোধাদের সঙ্গে সাঁওতালদের সম্পর্কের উত্তাপ বোঝানোর উদ্দেশ্যে ঔপন্যাসিক পান্না কোটালের প্রসঙ্গ এনেছেন। টাঁড়বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের বৃত্তটি এদের সবাইকে নিয়েই সম্পূর্ণ হয়। লেখক প্রসঙ্গ টানেন এইভাবে- ‘‘কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর অরণির এও মনে হল, এই জেলার একটা বড় অংশ মোরামে-পাথরে লালিত। সেখানে বাস আদিবাসীদের। সাঁওতাল ও লোধাদের সংখ্যাই বেশি, আরও আছে ওঁরাও, মুণ্ডা, কোড়া, হো, শবর, ইত্যাদি। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাপন, সবই জেলার অন্য বাসিন্দাদের থেকে এতটাই আলাদা, এতটাই নজর-কাড়া যে, অরণির হঠাৎ ভালবাসা জন্মে গেল এ-জেলার আদিবাসীদের ওপর। সে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করল সাঁওতালপাড়ায়।’’[১২৫]

S.D.O অরণির সঙ্গে পরিচয় হয় লোধা সমাজের প্রথম গ্রাজুয়েট পান্না কোটালের- ‘‘রোগা, কালো, চশমা পরা’’[১২৬] আপাত শান্ত, চুপচাপ পান্না কোটাল পাঠককে মনে করিয়ে দেয় বাস্তবের চুনি কোটালকে। উপন্যাসের এই অংশে লোধা সমাজকেন্দ্রিক যে তিনটি বিষয় উঠে এসেছে, তা হল – ১। দারিদ্র্য ২। ব্রিটিশ প্রণীত Criminal Tribes Act ৩। আন্তঃআদিবাসী দ্বন্দ্ব। দারিদ্র্য লোধাদের ছায়ার মতো, কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। পান্না কোটালের হাত ধরে পাঠক পৌঁছে যায় লোধা গ্রামের, সমাজের

একেবারে অন্দরে, মহুলডিহিতে। উপন্যাসে পাই- "একত্রিশ ঘর লোধার বাস। ঘরগুলো ছোট্ট ছোট্ট। ভেতরে কোনওক্রমে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায়। কারও চালে খড় নেই কারও দেওয়ালে মস্ত ফাট। কারও কপাট ভাঙা। তালপাতার টাটি অথবা বাঁশের চট দিয়ে তৈরি কপাটে কারও ঘরে নিরাপত্তা নেই। ঠেললেই খুলে যাবে। তবে নিরাপত্তার দরকারও হয় না তাদের, কেননা তাদের জীবনে গোপনীয়তা বলতে তেমন কিছু নেই। তাদের ঘরে নেবার মতো কিছু থাকে না।"[১২৭] খিদে আশি বছরের বেস্পতিকে ভালো থাকতে দেয় না, পথে-মাঠে গোবর খুঁজে বেড়ায় সে, ঘুঁটে বানিয়ে বেচতে পারলে তবে দুটো খেতে পাবে। লোধাদের প্রধান জীবিকা কাঠপাতা কুড়োনো। চিরকাল তারা বনে বনে কাঠ কুড়িয়ে, কন্দ–মূল, পড়ে থাকা ফল কুড়িয়ে ও খেয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছে। অথচ জঙ্গলের মাটিতে পড়ে থাকা ফল কুড়িয়েও তারা চোর হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার লোধাদের গায়ে সেঁটে দিয়েছিল চোর তকমা। ১৮৭১-এ প্রণীত হয়েছিল Criminal Tribes Act। ১৯১৬ সালে লোধাদের "অপরাধপ্রবণ জাতি" বা জন্মগত অপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন ভারতে ১৯৫২ সালে সরকার কর্তৃক "বিমুক্ত জাতি" ঘোষণা এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের "প্রিমিটিভ ট্রাইব" বলে স্বীকৃত হয়েও লোধারা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রের মানসিকতায় অপরাধপ্রবণ জাতিই থেকে যায়। শুধু পড়াশোনার অধিকার বিচ্যুতিই নয়, কোথাও অপরাধ ঘটলে, চুরি হলে, রাষ্ট্রের পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায় লোধাপুরুষদের- "পুলিশের চোখে সব লোধাই চোর"।[১২৮] পান্না সহপাঠী ও মাস্টারমশাইয়ের চোখে ঘৃণা দেখেছে, দেখেছে লোধারাও তাদের নিজস্ব বৃত্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়াশোনা করতে চায় না। পান্নার লোধাদের মধ্যে প্রথম স্নাতক হবার গৌরব অনুভব করে না মহুলডিহি। বুঝেছে, শুধু পড়াশোনা করার পরিবেশই লোধা ছেলেমেয়েরা পায় না, তা নয়; তাদের বিশ্বাস করানো হয় লেখাপড়া করার মেধা তাদের নেই। পান্না এই তৈরি করা মিথ ভাঙতে চেয়েছে, ভেঙেছে। উপন্যাসে মঙ্গল দিগারের

মৃত্যু Criminal Tribes Act-কেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মিথ্যে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া মঙ্গল দিগার পুলিশি হেফাজতে আত্মহত্যা করে। মেঝে থেকে মাত্র ৫ ফুট উঁচু জানলার গরাদে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে। ফলে পুরো ঝুলন্ত শরীরটাই হাঁটুতে ভড় দিয়ে পড়ে থাকে। ধন্দ লাগে আত্মহত্যা না পুলিশি খুন! হতে পারে সাঁওতাল প্রেমিকা ছলিয়ার কাছে চোর হয়ে যাওয়া তীব্র ক্ষত তৈরি করে মঙ্গলের হৃদয় জুড়ে, হয়তো সে সত্যি সত্যি আত্মহত্যাই করেছে; তবু এ আত্মহত্যা খুনেরই সামিল। দীর্ঘদিন ধরে অপরাধী তকমা, চোর অপবাদ সেঁটে দিতে দিতে, পুলিশি গারদে পেটাতে পেটাতে রাষ্ট্র মঙ্গল দিগারের ও মঙ্গল দিগারদের মতো আরও অনেক লোধার খুনি হয়ে ওঠে।

ছলিয়া সাঁওতাল রমণী। সাঁওতালদের সঙ্গে লোধাদের প্রণয় বা পরিণয় – কোনোটাই মান্যতা পায় না উভয় সমাজেই। তাই, মঙ্গলের মৃত্যুতে সাঁওতাল ও লোধাদের পারস্পরিক দোষারোপ চলতে থাকে, জাতিগত বিদ্বেষে মানুষ মঙ্গল, প্রেমিক মঙ্গল হারিয়ে যায় আর দোষীরা পার পেয়ে যায়। এর কারণ অবশ্য অসচেতনতা ও কৌমজীবনের বিধি-নিষেধের বেড়াজাল অতিক্রম করতে না পারা। তাই তো লোধা সমাজ পান্নার গ্রাজুয়েট হওয়ায় আনন্দিত হয় না, প্রথম লোধা মেয়ের গ্রাজুয়েট হওয়ার খবর খবরের কাগজে বেরোলে উচ্ছ্বসিত হয় না, বরং তারা ‘‘কুলহি’’তে পান্নার বিয়ে নিয়ে আলোচনা করে, পরাশরের সঙ্গে পান্নার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে- যে পরাশরের বাপ লোধা, মা সাঁওতাল, যে উভয় সমাজেই ব্রাত্য, সমাজচ্যুত। তাই পরাশরের সঙ্গে পান্নার সম্পর্ক মেনে নেয় না লোধা সমাজ। পান্নার মনে হয়- “লোধাও আদিবাসী, সাঁওতালরাও তাই। তাতে দুই উপজাতির মধ্যে কোথায় মিলমিশ থাকবে, এক সুতোয় বাঁধা থাকবে দুই আদিম মানুষের বংশধর, তা নয়, দু’জাতির মধ্যে ঘোর আকসা-আকসি। বিরোধ এতই চরমে যে, দু’জাতির মানুষের মধ্যে প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ।’’[১২৯] আর এই আন্তঃআদিবাসী বিরোধকে কাজে লাগায় রাজকিশোরের মতো সমাজের

প্রতিপত্তিশালীরা। সাঁওতালদের বর্গাদারি অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে, জমি থেকে উৎখাত করতে রাজকিশোর জমিতে লোধাদের দিয়ে লাঙল লাগায়। দিখু দিগারকে সে বেছে নিয়েছে জাতে শুধু লোধা বলেই নয়, অপরাধে তার নাম আছে বলে, সাঁওতালদের সঙ্গে সংঘাতের সাহস আছে বলেও। এক আদিবাসীকে, নিম্নবর্গীয়কে অধিকারচ্যুত করতে উচ্চবর্গীয়ের দল অন্য আদিবাসী, অন্য নিম্নবর্গীয়কে এইভাবেই ব্যবহার করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। লোধাদের বোনা জমিতে সাঁওতালরা "খোপ" দেয় অর্থাৎ লোধাদের বোনা ধানচারার ফাঁকে এক গোছা করে নতুন বীজ ধান পুঁতে দিয়েছে। ফলে আইনি দিক থেকে সাঁওতালদের জমির ফসলে অধিকার থেকে যায়। আইনি মস্তিস্কে দু'পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হন রাজকিশোর বালক নন্দীর কাছে। কিন্তু হাইকোর্টের রায় সাঁওতালদের বিপক্ষে যায়। রাজকিশোরের "বাগাল" হত্যুকি দাস মারা যায়, যে হত্যুকি দাসের জন্ম ইতিবৃত্তের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে আদিবাসী নারীদের ওপর উচ্চবর্গীয়ের যৌনশোষণের ইতিহাস, রাজকিশোরের নারীশরীর লোলুপতার ইতিহাস। হত্যুকি দাসের সঙ্গে রাজকিশোরের সম্পর্কটা লেখক নির্দেশ করলেন এভাবে- "তিনি মঙ্গলা সোরেনকে সাঁওতালপাড়া থেকে তুলে এনে রেখেছিলেন তাঁদের রাজবাড়ির আউটহাউসে। উদ্দেশ্য, চাকরানি হিসেবে কাজ করানো। কিন্তু বছর তিনেক পরে সে গর্ভবতী হয়। তার সন্তানের গায়ের রঙ ঈষৎ ফর্সা। কিন্তু নাক-মুখ-চোখ সবই সাঁওতালী ধাঁচের।...হত্যুকি দাস জন্মানোর পরই নাকি রাজকিশোরের স্ত্রী সুষমাবালা আত্মহত্যা করেন কাজলদিঘিতে ডুবে।"[১৩০] সাঁওতাল রক্ত গায়ে বইছিল বলেই হয়তো সাঁওতালদের সঙ্গে রাজকিশোরের সংঘাতের সময় মাঝে মাঝে তাকে দেখা যেত সাঁওতাল পাড়ায়, চিরকালের বিশ্বস্ত হত্যুকিকে দেখা যায় রাজকিশোরের কথায় আড়ি পাততে। ফলস্বরূপ মরতে হয় তাকে। লালতাকুঁড়ির রাস্তা কেটে দেয় রাজকিশোর। ক্ষেপে ওঠে সাঁওতালরা। নিজের ঘরে খুন হন রাজকিশোর। খুনির খবর জানা যায় না। রাজকিশোর

আর বালক নন্দীর কাছে যে জমির লড়াইটা ছিল ক্ষমতা দখলের লড়াই, তাইই সাঁওতালদের কাছে অস্তিত্ব রক্ষার, খিদের বিরুদ্ধে লড়াই। দুই যুযুধান ক্ষমতাবানের লড়াইতে আদিবাসীরা দাবার ঘুঁটি হয়ে যায়। এক রাজার মৃত্যু অন্য রাজাকে জিতিয়ে দেয় মাত্র। সিপাহীদের অবস্থার পরিবর্তন খুব বেশি হয় না। টাঁড়বাংলার মাটিতে রাজনৈতিক চাপানউতোর চলতে থাকে।

বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক যে জীবনধর্মের পরিচয় স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছে, তাতে দেখা যায় আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আদিবাসীরা ঈশ্বরভাবনায় শুধুমাত্র আস্তিকই নয়, তারা সর্বপ্রাণবাদী; স্পষ্টত জড়বাদী। দেবতার সঙ্গে তাদের ভক্তির চেয়ে ভীতির সম্পর্কই প্রধান। দেবতার রোষের সঙ্গে তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে, অর্থাৎ দেবতার রোষের হাত থেকে ব্যক্তি বা সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের কাছে পূজার্চনাই মুখ্য। এই কৌমসমাজে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি ভয় ও অন্ধবিশ্বাস দুইই প্রবল। জাদুমন্ত্র ও ডানবিদ্যাচর্চা আদিবাসী সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকলেও তা সামাজিক নিয়ম বা অনুশাসন মেনেই। বিবাহের ক্ষেত্রে সামাজিক বিধি-নিষেধ বা নিয়ম অবশ্য পালনীয়। সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘিত হলে তা কখনও কখনও কঠিন শাস্তিযোগ্য হয়ে ওঠে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, নর-নারীর প্রেম ও ব্যথা-বেদনার চিরন্তন ভাষ্য হয়েও এই উপন্যাসগুলো হয়ে উঠেছে কোনো এক বিশেষ সমাজের আলেখ্য।

তথ্যসূত্র :

১। বারিদবরণ চক্রবর্তী, *বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জুলাই ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ৩২০

২। সতীনাথ ভাদুড়ী, *ঢোঁড়াই চরিত মানস*, বেঙ্গল পাবলিশার্স(প্রা:) লিমিটেড, কলকাতা, নতুন মুদ্রণ নভেম্বর, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১০০

৩। H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal, Vol. ll,* The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1892, p- 138

৪। H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal, Vol. l,* The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1892, p- 83

৫। প্রফুল্ল রায়, "লেখকের কথা", *পূর্বপার্বতী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ৬

৬। প্রফুল্ল রায়, "লেখকের কথা", *পূর্বপার্বতী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ৫

৭। Verrier Elwin, *Nagaland*, P. Dutta for the Research Department, Advisory's Secretariat, Shillong, 1961, p- 4

৮। Verrier Elwin, *Nagaland*, P. Dutta for the Research Department, Advisory's Secretariat, Shillong, 1961, p- 8

৯। প্রফুল্ল রায়, *পূর্বপার্বতী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ২৬৯

১০। প্রফুল্ল রায়, *পূর্বপার্বতী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ৩০

১১। S. H. M. Rizvi, Shibani Roy, *Naga Tribes of North East India*, B. R. Publishing Corporation, Delhi, 2012, p- 27-28

১২। প্রফুল্ল রায়, *পূর্বপার্বতী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ২৮২

১৩। সুপ্রকাশ রায়, *বিদ্রোহী ভারত(১৭৬৩-১৯৮২),* র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১১৫

১৪। প্রফুল্ল রায়, *পূর্বপার্বতী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ৩৯৮

১৫। ভেরিয়ার এল্যুইন, *আদিবাসী জগৎ,* মহাশ্বেতা দেবী ও পৃথ্বীশ সাহা অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৬৩

১৬। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা), *কৃত্তিবাসী রামায়ণ,* বসুমতী কর্পোরেশন লিমটেড, কলিকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃষ্ঠা- ১২৯

১৭। নারায়ণ স্যান্যাল, *দণ্ডক-শবরী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১১

১৮। ভেরিয়ার এল্যুইন, *আদিবাসী জগৎ,* মহাশ্বেতা দেবী ও পৃথ্বীশ সাহা অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৬৯

১৯। Dr. S. T. Das, *Life Style Indian Tribes, Vol- 3,* Gian Publishing House, New Delhi, 1989, p- 191

২০। ভেরিয়ার এল্যুইন, *আদিবাসী জগৎ,* মহাশ্বেতা দেবী ও পৃথ্বীশ সাহা অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৭০

২১। নারায়ণ স্যান্যাল, *দণ্ডক-শবরী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪৬

২২। Verrier Elwin, *The Muria and Their Ghotul,* Oxford University Press, 1947, p- 625-626

২৩। নারায়ণ স্যান্যাল, *দণ্ডক-শবরী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা-২০৬

২৪। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, "আদিবাসী সমাজ ও ডাইনি বিশ্বাস", *ডাইনি,* কমল চৌধুরী সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৮২

২৫। নারায়ণ স্যান্যাল, *দণ্ডক-শবরী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা-১১৭

২৬। নারায়ণ স্যান্যাল, *দণ্ডক-শবরী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা-১২১

২৭। নারায়ণ স্যান্যাল, *দণ্ডক-শবরী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৫৩

২৮। Verrier Elwin, *The Muria and Their Ghotul,* Oxford University Press, 1947, p- 60

২৯। Verrier Elwin, *The Muria and Their Ghotul,* Oxford University Press, 1947, p- 355.

৩০। সমরেশ বসু, "দুই অরণ্য", *সমরেশ বসু রচনাবলী ৩,* সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা- ১৮৮

৩১। সমরেশ বসু, "দুই অরণ্য", *সমরেশ বসু রচনাবলী ৩,* সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা- ২৪৯

৩২। সমরেশ বসু, "দুই অরণ্য", *সমরেশ বসু রচনাবলী ৩,* সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা- ১৯৫

৩৩। নির্মলকুমার বসু, *হিন্দুসমাজের গড়ন,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ২০-২১

৩৪। সমরেশ বসু, "দুই অরণ্য", *সমরেশ বসু রচনাবলী ৩,* সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা- ১৯০

৩৫। Sarat Chandra Roy, *The Mundas and Their Country,* The City Book Society, Calcutta, 1912, p- 473

৩৬। বুদ্ধদেব গুহ, *সাসান্‌ডিরি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, জুন ২০১২, পৃষ্ঠা- ২৮-২৯

৩৭। বুদ্ধদেব গুহ, *সাসান্‌ডিরি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, জুন ২০১২, পৃষ্ঠা- ২২

৩৮। বুদ্ধদেব গুহ, *সাসান্‌ডিরি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, জুন ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩৬

৩৯। "The Munda tribe is divided into a large number of exogamous groups called *kilis*" - Sarat Chandra Roy, *The Mundas and Their Country,* The City Book Society, Calcutta, 1912, p- 400

৪০। বুদ্ধদেব গুহ, *সাসান্‌ডিরি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, জুন ২০১২, পৃষ্ঠা- ৪০

৪১। Sarat Chandra Roy, *The Mundas and Their Country,* The City Book Society, Calcutta, 1912, p- 457

৪২। বুদ্ধদেব গুহ, *সাসান্‌ডিরি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, জুন ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৩১

৪৩। বুদ্ধদেব গুহ, *সাসান্‌ডিরি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, জুন ২০১২, পৃষ্ঠা- ৮০-৮১

৪৪। Sarat Chandra Roy, *The Mundas and Their Country,* The City Book Society, Calcutta, 1912, Appendix I, p- v

৪৫। Sarat Chandra Roy, *The Mundas and Their Country,* The City Book Society, Calcutta, 1912, Appendix I, p-ix

৪৬। বুদ্ধদেব গুহ, *সাসান্‌ডিরি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, জুন ২০১২,পৃষ্ঠা- ১১৩

৪৭। বুদ্ধদেব গুহ, *পারিধী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৪৮-৪৯

৪৮। বুদ্ধদেব গুহ, *পারিধী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৮৫

৪৯। Kiran Bala Debi, "Kondh", *Adibasi, Vol. V,* Number Three, Edited by G. N. Das, 1st January, 1964, Tribal Research Bureau Orissa, p- 70, www.scstrti.in, Accessed on 8/4/20

৫০। Kiran Bala Debi, "Kondh", *Adibasi, Vol. V,* Number Three, Edited by G. N. Das, 1st January, 1964, Tribal Research Bureau Orissa, p- 71, www.scstrti.in, Accessed on 8/4/20

৫১। বুদ্ধদেব গুহ, *সাসান্‌ডিরি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, জুন ২০১২, পৃষ্ঠা- ১২১

৫২। হরিভূষণ পাল, *'৪৩-এর রিয়াং বিদ্রোহ ও রতনমণি,* সৈকত, আগরতলা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১০-১১

৫৩। অসিতচন্দ্র চৌধুরী, *স্বাধীন ত্রিপুরা সেন্সাস রিপোর্ট ১৩১০ ত্রিপুরা (১৯০১ খ্রিস্টাব্দ),* ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা, আগরতলা, প্রথম মুদ্রণ ১৩১৫ ত্রিং, ৩০শে ফাল্গুন, পৃষ্ঠা- ৩১

৫৪। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৭৪

৫৫। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৮৭

৫৬। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৯০

৫৭। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৮৭

৫৮। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৭৮

৫৯। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৮৮

৬০। অসিতচন্দ্র চৌধুরী, *স্বাধীন ত্রিপুরা সেন্সাস রিপোর্ট ১৩১০ ত্রিপুরা (১৯০১ খ্রিস্টাব্দ),* ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা, আগরতলা, প্রথম মুদ্রণ ১৩১৫ ত্রিং, ৩০শে ফাল্গুন, পৃষ্ঠা- ৩৩

৬১। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ২০৩

৬২। বিজয় কুমার দেববর্মণ, *ত্রিপুরার উপজাতি বিবাহবিধি উৎসব ও পূজা পার্বণ,* পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩২

৬৩। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯,পৃষ্ঠা- ২০৬

৬৪। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ২১৮

৬৫। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ২২১

৬৬। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ২২৫

৬৭। বিমল সিংহ, *লংতরাই,* "বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ", ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ২৩৩

৬৮। বিমল সিংহ, *লংতরাই,* "বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ", ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৭০

৬৯। বিমল সিংহ, *লংতরাই,* "বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ", ত্রিপুরা দর্পণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৯৬

৭০। Bipul Mandal, Manadeb Roy, *The Rabha and Their Social Movement (1925-1950): A Case Study of North Bengal*, *IOSR Journal of Humanities And Social*

Science (IOSR-JHSS), Volume-10, Issue3 (March–April2013), p- 6, www.Iosrjournals.Org, Accessed on 30/3/2020

৭১। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "বিনদনি", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৭,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৯৭

৭২। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "বিনদনি", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৭,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৯১

৭৩। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "সোঁদাল", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৮,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০ সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৮০

৭৪। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "বিনদনি", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৭,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা - ৯৩

৭৫। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "বিনদনি", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৭,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১২০

৭৬। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "বিনদনি", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৭,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১০৮

৭৭। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "বিনদনি", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৭,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১২৯

৭৮। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "বিনদনি", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৭,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১৪০

৭৯। Manish Kumar Raha, *Matriliny to Patriliny, A Study of the Rabha Soceity*, Gian Publishing House, New Delhi, 1989, p- 33

৮০। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "মাকচক হরিণ", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৮,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০ সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ২৮৫

৮১। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "বিনদনি", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৭,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১০৭

৮২। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "সোঁদাল", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৮,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ৮২

৮৩। Manish Kumar Raha, *Matriliny to Patriliny, A Study of the Rabha Soceity*, Gian Publishing House, New Delhi, 1989, p- 250-251

৮৪। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "মাকচক হরিণ", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৮,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ২৮১

৮৫। নির্মল ঘোষ, *মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১১৫

৮৬। মহাশ্বেতা দেবী, "জঙ্গল", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র চতুর্দশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৩৫

৮৭। মহাশ্বেতা দেবী, "অর্জুন", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র চতুর্দশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪০৪

৮৮। মহাশ্বেতা দেবী, ‘‘অর্জুন’’, *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র চতুর্দশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪০৬

৮৯। মহাশ্বেতা দেবী, ‘‘জঙ্গল’’, *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র চতুর্দশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৩৭

৯০। মহাশ্বেতা দেবী, ‘‘জঙ্গল’’, *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র চতুর্দশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৫২

৯১। মহাশ্বেতা দেবী, ‘‘জঙ্গল’’, *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র চতুর্দশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৬২

৯২। মহাশ্বেতা দেবী, ‘‘ভূমিকার পরিবর্তে’’, *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র চতুর্দশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত ,দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১০

৯৩। গুরুচরণ মুর্মু, ‘‘ডাইনি’’, *ডাইনি,* কমল চৌধুরী সম্পাদিত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৬৪

৯৪। সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া, *ডাইনি হত্যার উৎস সন্ধানে,* সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৬৮

৯৫। ভগীরথ মিশ্র, ‘‘জানগুরু’’, *দুটি উপন্যাস,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩৪৮

৯৬। সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া, *ডাইনি হত্যার উৎস সন্ধানে,* সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩৪

৯৭। সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া, *ডাইনি হত্যার উৎস সন্ধানে,* সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩৫

৯৮। ভগীরথ মিশ্র, ''জানগুরু'', *দুটি উপন্যাস,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২৬৫

৯৯। সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া, *ডাইনি হত্যার উৎস সন্ধানে,* সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১৫

১০০। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- উৎসর্গপত্র

১০১। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১১

১০২। H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal, Vol-ll,* Firma Mukhopadhyay, Calcutta, 1981, p- 225

১০৩। H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal, Vol-ll,* Firma Mukhopadhyay, Calcutta, 1981, p- 226

১০৪। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১১১

১০৫। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৪

১০৬। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৪

১০৭। H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal, Vol-ll,* Firma Mukhopadhyay, Calcutta, 1981, p- 232

১০৮। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৩-২৪

১০৯। U. K. Ray, A. K. Das, S. K. Basu, *To be with Santals,* Cultural Research Institute, Scheduled Castes And Tribes Welfare Department, Government of West Bengal, Calcutta, 1982, p- 59

১১০। H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal, Vol-ll,* Firma Mukhopadhyay, Calcutta, 1981, p- 233

১১১। U. K. Ray, A. K. Das, S. K. Basu, *To be with Santals,* Cultural Research Institute, Scheduled Castes And Tribes Welfare Department, Government of West Bengal, Calcutta, 1982, p- 61

১১২। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৬৪

১১৩। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৬৪

১১৪। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৮১-৮২

১১৫। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৫৩

১১৬। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৫১

১১৭। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১১৩

১১৮। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৫৮

১১৯। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৫৩

১২০। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১০৫

১২১। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১২৩

১২২। চিত্তরঞ্জন দাশ, *পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি-অর্থনীতি*, এম এল আর সি, কলকাতা, মে ২০১০ পৃষ্ঠা- ৯৫

১২৩। চিত্তরঞ্জন দাশ, *পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি-অর্থনীতি,* এম এল আর সি, কলকাতা, মে ২০১০ পৃষ্ঠা- ৯৯

১২৪। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *টাঁড় বাংলার উপাখ্যান,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা- ১৩৯-১৪০

১২৫। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *টাঁড় বাংলার উপাখ্যান,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা- ৯৫

১২৬। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *টাঁড় বাংলার উপাখ্যান,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা- ৯৫

১২৭। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *টাঁড় বাংলার উপাখ্যান,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা- ৯৭-৯৮

১২৮। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *টাঁড় বাংলার উপাখ্যান,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা- ১১০

১২৯। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *টাঁড় বাংলার উপাখ্যান,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা- ১০৩

১৩০। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *টাঁড় বাংলার উপাখ্যান,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা- ১৪১